প্রাক্ কথন

সব আরম্ভের আগেই আরম্ভ থাকে; শিল্প সাহিত্যে সৃজনশীলতায় এবং জিজ্ঞাসায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ প্রত্যয়টির ব্যবহারের আগেও আরম্ভ ছিল। সে আরম্ভ বাস্তববাদের, যে বাস্তববাদ স্বয়ংস্ফূর্ত আন্দোলন রূপে, আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে সত্যসন্ধানী সাহিত্যকর্ম রূপে, ইওরোপীয় সাহিত্যকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অভিনবত্বের ঐশ্বর্যে উজ্জীবিত করে রেখেছিল।

এই অভিজ্ঞতা নতুন। শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইওরোপে মানুষের আপন সত্তা ও সমাজ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার অভিজ্ঞতা নতুন। এই অভিজ্ঞতায় সমকালীন চিন্তা-বিপ্লবের অবদান—যার মৌল অনুপ্রেরণা বিজ্ঞান ও দর্শন—অপরিসীম। জাতীয় ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিবর্তন, এর সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তর, স্বর্ণ-মৃগয়া ও পরিণামে লুণ্ঠন-শোষন-নিপীড়ন, বস্তু-রতি, মানবিক সত্তার অবক্ষয়, জীবন-ধারণের উপকরণে অসম অধিকার ও বঞ্চনা—এই সামগ্রিক পটভূমিতে সংস্থাপিত মানবিক অভিজ্ঞতার উপলব্ধি স্বভাবতই সংবেদনশীল চিত্তে এই ব্যবস্থার অন্তরনিহিত অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমালোচনার প্রেরণা জাগায়। সমকালীন উপন্যাসে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার নির্মোহ ব্যবচ্ছেদ ও মূল্যায়ন আত্মপ্রকাশ করে। সেই বস্তুনিষ্ঠ ব্যবচ্ছেদ সমাজক্রান্তি ও মানবিক আত্মজিজ্ঞাসার নিরিখে এতই অর্থবহ ছিল যে মার্কস বিমোহিত হয়েছিলেন; বলেছিলেন, ইংল্যাণ্ডের বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকগণ তাঁদের বিবরণের প্রাণবন্ততা ও সোচ্চার চরিত্রায়ণের মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্য এমন বিপুল ভাবে উন্মোচন করেছেন যে রাজনীতিবিদ প্রচারবিদ ও নীতিবিদদের সমবেত সামর্থ্য দ্বারাও তা সম্ভবপর হত না। তথাপি, এর সীমা ছিল সুচিহ্নিত। কারণ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শোষণভিত্তিক অসমতার নিবৃত্তি কোন পথে, অন্য কথায় সমাজক্রান্তির পরবর্তী সম্ভাবনাময় স্তর কি, সে সম্পর্কে এই বাস্তববাদ ছিল অনাগ্রহী। তৎসত্ত্বেও, ঐ সীমার মধ্যেও, এর উল্লেখনীয় কৃতিত্ব সেই মানুষকে আবিষ্কার করার প্রয়াস যে মানুষ সতত অত্যাচারিত হয়, সংগ্রাম করে, পরাভূত হয় কিন্তু পুনরায় জেগে ওঠে এবং রক্তাক্ত দেহে চিরকাল এগিয়ে যায়। সাহিত্যে এই

মানুষকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত করার অভিজ্ঞতা—সে রূপায়ন সোচ্চারই হোক বা অনুচ্চারিতই থাকুক—নতুন। প্রাচীন ধ্রুপদী শিল্পাদর্শে অথবা রোমান্টিকতার মায়াময়তায় এর বাস্তব স্বীকৃতি প্রায় ছিল না; বস্তুবোধে ও মানবিক সম্পর্কের বোধে এ যথাযথ।

বলা বাহুল্য, সাহিত্যে সত্যসন্ধানী বাস্তববাদের এই বিবর্তনের সমান্তরাল ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বৃহত্তর জনসমষ্টির রাজনৈতিক সংগ্রাম, এবং সেই সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা। সামাজিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্য ও উপলব্ধি, ইতিহাসের রূপান্তরে ব্যক্তির ভূমিকা, সমাজপ্রবাহের অন্তর্লীন সূত্র, ইত্যাদির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করে যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদ্ভূত মানবিক সমস্যার সমাধান একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সম্ভবপর। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নবাবিষ্কৃত মানুষকে, বিগত শতাব্দীর দিকে, নতুনতর চেতনায়, বোধে, দায়িত্বে, কর্মে উজ্জীবিত করে; তার আত্মোপলব্ধির ভুবন ও বিশ্বদৃষ্টি বিপুল ব্যাপ্তি অর্জন করে, অর্জন করে সর্বমানবিক অর্থবহ তাৎপর্য। পূর্ববর্ণিত পটভূমিতে সংগ্রামশীল বিবর্তনশীল এই মানুষই সাহিত্যের উপজীব্য। এই মানুষের অনুভবে তার আত্মগত বোধ ও ব্যবহারিক কর্মজগতের মধ্যে কোন বিরোধ অথবা বৈসাদৃশ্য নেই। তা একসূত্রে বাঁধা। এই মানুষই সাহিত্যের পৃষ্ঠায় লাভ করে মহাকাব্যিক ঐশ্বর্য। কিন্তু, যেহেতু পূর্বকথিত বাস্তববাদ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের স্বীকৃতির স্তর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেনি, সেই হেতু সমাজ ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্কের গতিশীলতার সূত্র অনুযায়ী নতুনতর বাস্তববাদী মনোভঙ্গির আবির্ভাব অপরিহার্য হয়ে ওঠে, যে মনোভঙ্গি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে নীতিগতভাবে একাত্ম। ম্যাক্সিম গোর্কি এই বাস্তববাদের নামকরণ করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রূপসৃষ্টি এই বাস্তববাদের প্রাথমিক প্রত্যয়। প্রচলিত এবং রূপান্তরশীল সামাজিক সম্পর্কের এই উভয়বিধ প্রবণতার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের জন্য এই শ্রেণীর বাস্তববাদী শিল্পের আনুভূমিক আবেদন অনেক বেশি নির্দিষ্ট, বস্তুসম্পর্কে ও মানবিক সম্পর্কের উপলব্ধিতে অনেক বেশি সচেতন। শিল্পের আপন সত্যে স্থিত মহৎ শিল্পী প্রতিটি দেশে সব যুগেই অন্যায়-অবিচার-অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন, মানবিক বিবেককে প্রহার করেছেন, জাগ্রত করেছেন। অস্ফুট ক্রন্দনকে

দিয়েছেন ভাষা। সেই ভাষা মানব-অভিযানকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করলেও সমাজ-সম্পর্কের নির্দিষ্টতায় ব্যক্ত হয়েছে কদাচিৎ। মানুষের আর্তি স্বপ্ন অধ্যাস নির্বস্তুক রূপ গ্রহণ করেছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী শিল্পী এ:কে দিতে চেয়েছেন নির্দিষ্ট অবয়ব। ইওরোপীয় সাহিত্যের তিনটি বিচ্ছিন্ন যুগ থেকে তিনটি কাব্যাংশ উদ্ধৃত করা যাক, তাহলে পার্থক্যটা উপলব্ধি করা সহজতর হবে। প্রথম অংশটি ঈস্কাইলাস থেকে, জিউসের উদ্দেশ্যে বন্দী প্রোমেথিউসের সদম্ভ উক্তি—

At one cast let him fling me afar to black Tartarus,
cruelly whirled
As Necessity wills to Hell's uttermost depth, at the base
of the world :—
Yet he never can doom me to death. I shall live evermore.

দ্বিতীয়টি গ্যায়টের 'ইলিজি' থেকে—And if man falls speechless in his torment God give me to say what I suffer.

তৃতীয়টি ব্রেশ্‌ট থেকে—

Dreams and the golden 'if'
Conjure the promised sea
Of ripe corn growing
Sower, say of the harvest
You will reap tomorrow
That it is your own today.

ঈস্কাইলাস ও গ্যায়টের উক্তিতে মানবচিত্তের অবিনশ্বর ঐশ্বর্য উদ্‌ভাসিত, কিন্তু তা বস্তু সম্পর্কের মধ্যে স্থিত নয়। পক্ষান্তরে, বাস্তব উপাদান-সম্পর্কের মধ্যে বিবৃত থেকে ব্রেশ্‌ট উচ্চারণ করেছেন সংগ্রামের আহ্বান। এই নির্দিষ্টতা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অনায়াসলক্ষ্য বৈশিষ্ট্য; এই নির্দিষ্টতার অপর নাম শ্রেণী-সচেতনতা। এই শ্রেণী-চরিত্র অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের সঙ্গে আত্মিক ঐক্য স্থাপন করে, একে আপন করে নিয়ে, শিল্পী-মানস নতুন উপলব্ধিতে—অনুরাগে, প্রকরণে অভিব্যক্তি লাভ করে।

হাঙ্গেরীর বিশ্ববিখ্যাত তাত্ত্বিক-সমালোচক লুকাচ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক মনোভঙ্গির

নির্দিষ্টতাই এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়; সমাজ-সম্পর্কের ভেতরের দিক থেকে, অর্থাৎ মানব-সম্পর্কের দিক থেকে, কোন্ কোন্ শক্তি সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পক্ষে ক্রিয়াশীল, পূর্বোক্ত নির্দিষ্টতার সহায়তায় তার উন্মোচনও এর বৈশিষ্ট্য। এই দৃষ্টিমার্গ থেকে দেখা ভাবী সমাজতান্ত্রিক সমাজ একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা, শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকল্প নয়, ধনতন্ত্রের সংকট থেকে মুক্তির আশ্রয়মাত্রও নয়। ঐ মানবিক শক্তিগুলোর আনুভূতিক উন্মোচনই মুখ্য কথা। সমাজপ্রবাহের নিয়ম অনুসরণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে, বাইরের দিক থেকে, রূপান্তরের সূত্র আবিষ্কার করেন, আর বাস্তববাদী শিল্পী মানুষের বিশেষত শোষিত শ্রেণীর, আর্তি ও সংগ্রামের চিত্র উন্মোচন করে, ভেতরের দিক থেকে, নতুন সমাজব্যবস্থার বাঁক নির্দেশ করেন। এদিক থেকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জনগণের সংগ্রাম এবং শিল্প-সাহিত্যে তার আনুভূতিক প্রতিফলন এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংযুক্ত। গোর্কি যে রাশিয়ার সমাজবিপ্লবের ইতিহাসে এমন অবিস্মরণীয় অবদান রেখে যেতে পেরেছেন তার কারণ, তাঁকে চেষ্টা করে জনগণের সাহায্য লাভ করতে হয়নি; তিনি ছিলেন তাদেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শ্রেণীসচেতন শিল্পীগণ তাঁদের শিল্পকর্মকে কিভাবে উপলব্ধি করেছেন, বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন স্রষ্টার নিজ নিজ সাক্ষ্য বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পৃষ্ঠার সীমাবদ্ধতায় তা থেকে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বক্তব্য এখানে বিশ্লেষণ করা হল। গোর্কি লিখেছেন, জীবনের দারিদ্র্য পীড়িত ক্লান্তিকর পীড়ন ও সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তাঁর রচনার প্রাথমিক প্রেরণা। সেই অভিজ্ঞতায় সহস্র মানুষের আর্তি তিনি শুনতে পেয়েছেন, আমাকে সৃষ্টি কর, আমাকে সৃষ্টি কর। সেই আর্তির মধ্যে, জীবনের কঠোর কঠিন প্রাঙ্গণে তিনি সাক্ষাত পেয়েছেন অসাধারণ মানুষের, যাদের শ্রম ও সংগ্রাম তাঁকে শিল্পী হিসেবে বিনম্র করেছে। তাদের অস্তিত্বের মধ্যে গ্রথিত পবিত্র অসন্তোষকে তিনি প্রণাম জানিয়েছেন; তাই তাঁর শিল্পে বাস্তববাদ ও রোমান্টিক স্বপ্নের সংশ্লেষ ঘটেছে, যাতে আছে শ্রম ও সংগ্রামের জয়গান, আর নতুন অভ্যুদয়ের আশ্বাস।

অঁরি বারবুস প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পেয়েছেন কিভাবে সৈনিকদের বিবেক জাগ্রত হয়ে উঠেছে, লোভীর লোভের নিকট আত্মসমর্পণ না করার জন্য তারা সংগ্রামী হয়ে উঠেছে। সেই অভিজ্ঞতাই যুদ্ধশেষে তাঁকে সংগ্রামী করে তোলে; তিনি অনুভব করেন, সমষ্টিগত নাটকের আঙিনায় সকলকে দাঁড়াতে হবে। কেন না, সামষ্টিক নাটক অনেক বেশি

চিত্তহারী ; মৃত্যুতে এ নাটক শেষ হয় না, কারণ এর নায়কের ভূমিকায় রয়েছে চিরন্তন জনসমষ্টি, মৃত্যুহীন। ভাবীকালের স্রষ্টা সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে শিল্পীদের মিলতেই হবে, এবং যতদিন বর্তমান সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে ততদিন সাহিত্যকে তার সংগ্রামী ভূমিকায় অকুতোভয় থাকতে হবে।

আরাগঁর দৃষ্টিতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ একটি জীবন্ত জীবনবেদ। এ হল সাহিত্যের অগ্রণী বাহিনী ; এর সঙ্গে সমগ্র সাহিত্যের যোগসূত্র রক্ষা করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক দেশেই যে কেবল ঐ বাস্তববাদের উদ্ভব সম্ভব, এ ধারণা সত্য নয়। সব দেশেই তা ছিল এবং আছে। "এই বাস্তববাদ মানুষকে সাহায্য করে, তাকে পথ চলতে আলো দেখায়, তার অগ্রগতির দিশা নির্ণয় করে এবং সর্বদা তার অভিযানের শীর্ষদেশে অবস্থান করে।" কোন ভৌগোলিক সীমা দিয়ে এই বাস্তববাদ সীমিত নয়। এর সাহায্যে লেখক তার আপন ব্যক্তি-পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করে, শিল্পকলার অফুরন্ত বিস্তারকে ব্যাখ্যা করে, এবং একে মানবিক অগ্রগতির সঙ্গে একীভূত করে দেখে।

পাবলো নেরুদা ছিন্নবাস শ্রমিকদের সভায় কবিতাপাঠের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন ; দেখেছেন, স্পেনের গৃহযুদ্ধের উপর রচিত কবিতা শুনে শ্রমিকরা অভিভূত হয়, চোখে জল আসে। এ পথেই কবিতার রূপান্তর। আপন সত্তা দিয়ে তিনি অনুভব করেছেন, কবিতাকে মানুষের হৃদয়ের কাছে যেতেই হবে, তবেই কবিতা বেঁচে থাকবে। তাঁর ধারণা, যে কবি বাস্তববাদী নয়, সে মৃত। তিনি লিখেছেন, জনগণের মধ্যে মিশে গেলে আমি বদলে যাই ; মানবতারূপ মহীরুহের আমি একটি পাতা। জনগণের কাছ থেকে অনেক শিখেছি, তাদের আশার প্রতীক হওয়া এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

ব্রেশ্‌ট-এর নিকট সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ শুধুই একটা ভঙ্গি বা শিল্পরীতি নয়, একটা সংগ্রামী আয়ুধ। মিথ্যা ও অন্যায়ের জাল ছিন্নভিন্ন করে যারা সর্বমানবিক মুক্তির জন্য সংগ্রামরত, সেই শ্রেণীর দৃষ্টিমার্গ থেকে সাহিত্যসৃষ্টির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। জনগণের অংশগ্রহণ কিভাবে নন্দনতত্ত্বের ধারণাকে সমৃদ্ধ এমন কি রূপান্তরিত করে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর অভিমত, সজীব বেগবান সংগ্রামী সাহিত্যসৃষ্টির জন্য বাস্তব সমাজশক্তির সাহসিক অগ্রগতির সঙ্গে সাহিত্যকেও এগিয়ে যেতে হবে। ব্রেশ্‌ট সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের আদর্শকে ১৯৫৪ সনে কয়েকটি সূত্রাকারে উপস্থাপন করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখনীয়, "সমাজতান্ত্রিক

বাস্তববাদ হল সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পসম্মত উপায়ে বাস্তবানুগ জীবন ও মানবিক সম্পর্কের রূপায়ণ।"....

"এই রূপায়ণ সমাজ প্রবাহের অন্তঃস্থলে অনুপ্রবেশ করায় সহায়ক হয়, সমাজতন্ত্রসুলভ আত্মিক প্রেরণা সঞ্চার করে।"

"সমস্ত শ্রেণীর শিল্পকর্ম যে আনন্দ-সংবেদনা জাগায় সেই আনন্দ-সংবেদনা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় এই আত্মজ্ঞানের স্বীকৃতিতে ব্যক্ত হয় যে, সমাজ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে সক্ষম।"

"সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের নীতি অনুসরণে রচিত শিল্পকর্ম সামাজিক বিবর্তনের দ্বান্দ্বিক সূত্র উন্মোচন করে; এই জ্ঞান ব্যক্তিক ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে সমাজকে সাহায্য করে। এরূপ শিল্পকর্ম মানুষকে এবং ঘটনাপ্রবাহকে ইতিহাস-নিয়ন্ত্রিত, রূপান্তরশীল, এবং স্ববিরোধযুক্ত বলে চিত্রিত করে।"

"সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতের যেসব ধ্রুপদী সাহিত্যের নাট্যাভিনয় করা হয়েছে তার পশ্চাতে ছিল এই প্রত্যয় যে, মানুষ সেই সব শিল্পকর্মকেই সযত্নে সংরক্ষণ করে আসছে যা অধিকতর শক্তিধর, অধিকতর সাহসিক এবং অধিকতর সংবেদনশীল মানবতার নিরবচ্ছিন্ন বিকাশকে শিল্পরূপ দান করে এসেছে।"

ব্রেশ্‌ট নতুন আঙ্গিকের উদ্‌ভাবনের ব্যাপারেও চিন্তিত ছিলেন। অবশ্য তাই স্বাভাবিক। আঙ্গিক তো আদর্শগত ও শিল্পজ্ঞানের মৌল নীতির সমবায়ে এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের অভিজ্ঞতা দ্বারা গঠিত হয়, সমৃদ্ধ হয়। সুতরাং, ইতিহাসের পরম্পরায় কোন বিশ্লিষ্ট ভাবাদর্শগত রূপান্তর ঘটলে আঙ্গিকের রূপান্তরও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। আসল কথা, শিল্প-সাহিত্যের স্রষ্টা ও উপকরণ যে মানুষ তার থেকে কোন অবস্থাতেই শিল্পের বিচ্যুত বিচ্ছিন্ন থাকা সঙ্গত নয়; সেভাবে বিচ্ছিন্ন শিল্প মৃত। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে দীক্ষিত শিল্পী তাই গ্রহণ করেছেন সংগ্রামীর, অগ্রচারীর ভূমিকা। তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক আদর্শ, বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অসম্পূর্ণতা ও বিকৃতির বিরুদ্ধে সৃষ্টিরই মাধ্যমে সংগ্রাম; অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যক্ষ যে সংগ্রাম, মানব-সম্পর্কের অনুভব উপলব্ধির সংবেদনার জগতে সেই সংগ্রামের অংশীদার হওয়া এবং একে প্রসারিত করা। এই ভূমিকা গ্রহণে দিনক্ষণ নির্বাচনের কোন প্রশ্ন নেই, যে কোন অবস্থায় স্তরে ও লগ্নে তা আরম্ভ করা যেতে পারে।

এই অগ্রচারী শিল্পের দৃষ্টিতে মানুষ, কালের পরিমাপে, ত্রি-মাত্রা যুক্ত অর্থাৎ

যুগপৎ অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে প্রসারিত সামাজিক ব্যক্তি। গোর্কির 'মা' উপন্যাসের পাভেল ভ্লাসোভের মত চরিত্ররা সত্যসত্যই ত্রি-মাত্রিক। অতীতের গ্লানিভরা জীবনের যেসব চিহ্ন দেহমনে সংলগ্ন ছিল তা সব ধুয়ে মুছে তারা এর বন্ধন থেকে মুক্ত হচ্ছে, বর্তমান কালে আত্মনিবেদন করছে সংগ্রামে, আর এক ঐশ্বর্যময় ভঙ্গিমায় এগিয়ে চলেছে ভাবীকালের পথে। এই রূপান্তরই সম্ভবত যাকে বলা হয় আশায় দীপ্ত উর্ধায়ন। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয়, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীর বাস্তব নিছক অকর্মক জড় বাস্তব নয়, সে বাস্তব প্রতি মুহূর্তে মানুষের শ্রমে ও সংগ্রামে সৃষ্ট হতে থাকা এক সত্তা। এর প্রতিফলনে অচেতন সমাজ প্রবাহ চৈতন্যময় হয়ে ওঠে; এবং সামাজিক অগ্রগতির বর্তমান পর্বে ইতিহাসের নির্মাতা শ্রমজীবী মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুভূত জীবন নতুন তাৎপর্যে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। আনকোরা তথ্যের কোন অদলবদল নেই, তা একই রকম থাকে; কিন্তু কোন এক বিশেষ মুহূর্তের বাস্তব ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বদৃষ্টি অনুযায়ী বদলায়। যাকে ভাবীকালের জিনিস বলে জানি, অর্থাৎ সম্ভাবনাময়, তা মনের অন্তর্লোকে অতীতের কোন ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় মানস-প্রক্রিয়ার কোন এক মুহূর্তে। ফলে, শুধু যে স্মৃতি নতুন ব্যঞ্জনায় শ্রীমণ্ডিত হয় তা নয়; তা সেই মুহূর্তের বাস্তবকেও নতুনভাবে প্রকাশ করে; নতুন ইঙ্গিত জানায়, যা সে সময় অস্পষ্ট ছিল। শিল্পী-মানসে এমনিভাবেই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যুগপৎ আসা যাওয়া করে। মিশ্রিত হয়, এবং রূপসৃষ্টি ত্রি-মাত্রা অর্জন করে।

এই বাস্তববাদের সঙ্গে রোমাণ্টিক মনোভঙ্গির সম্পর্ক কি, বা আদৌ কিছু আছে কিনা, সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। এ বিষয়ে সোভিয়েত সাহিত্য তাত্ত্বিকগণ একমত, তাও নয়। গোর্কি কিন্তু বাস্তববাদের সঙ্গে রোমাণ্টিসিজমের সৃজনী দৃষ্টিভঙ্গির সংযোগ বাসনা করেছিলেন, যা শ্রমের ও সংগ্রামের জয়গানে মুখর হবে এবং অতীতের অশুভ উত্তরাধিকার সম্পর্কে শেখাবে ঘৃণা। সোভিয়েত লেখক গ্লাদকোভের নিকট লিখিত একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, বর্তমান কালের দাবি—লেখক অথবা শিল্পী অস্তিত্বের নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে উদাসীন থাকবেন না; একই সঙ্গে তিনি ইতিবাচক দিকগুলোর উপর অধিকতর গুরুত্ব দান করবেন এবং একে রোমাণ্টিক আস্বাদে ভরে দেবেন। ইংরাজিতে বয়ানটি এইপ্রকার: **The present day requires that the author or artist does not shut his eyes to negative phenomena; at the same time, he should emphasise and thereby 'romanticise'**

positive phenomena. বাস্তবের উপলব্ধির এই বৈশিষ্ট্য থেকে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের সঙ্গে রোমান্টিক মনোভঙ্গির প্রকৃত কোন বিরোধ নেই; বরং বলা যায়, রূপান্তরিত হতে থাকা বাস্তবের আন্তর সম্পদ ও তাৎপর্য উন্মোচনে এরা পরস্পরের পরিপূরক এবং উদ্দেশ্যের সমতায় একই বিন্দুতে সংশ্লেষিত। সোভিয়েত উপন্যাসিক ফাদায়েভও একদা প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের অগণিত প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে রোমান্টিক প্রকাশভঙ্গি শুধু যে নীতিসম্মত তা নয়, মানুষের নিকট নিশ্বাসবায়ুর মতই প্রয়োজনীয়। এই বক্তব্যে তিনি যে কেবল বৈপ্লবিক রোমান্টিক মনোভঙ্গি বোঝাতে চেয়েছেন তা নয়, জীবন-সত্য প্রকাশের রোমান্টিক রীতিকেও গ্রহণ করেছেন। যা মানুষকে বিকৃত ও খাটো করে, তার প্রতি অপরিসীম ঘৃণা এই রোমান্টিক বাস্তববাদের উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য।

প্রসঙ্গত লেভিন-মাকারেঙ্কো বিতর্কের উল্লেখ করা যেতে পারে। মাকারেঙ্কোর শিশুচরিত্রেরা দেহসৌষ্ঠবে সকলেই খুব সুন্দর, এই অভিযোগ উত্থাপন করে সমালোচক লেভিন তাঁকে তিরস্কার করে বলেন এটা বাস্তবসম্মত নয়। উত্তরে মাকারেঙ্কো লেভিনের উদ্দেশ্যে রচিত একটি খোলা চিঠিতে বলেন: 'আমার উপন্যাসে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর শিশুচরিত্র আছে বলে আপনি আমাকে যে তিরস্কার করেছেন, তা গ্রহণে আমি অক্ষম। আমি সব শিশুকেই সুন্দর দেখি—এটা আমার অধিকার। 'ওয়র অ্যাণ্ড পীস' গ্রন্থে অগণিত সুন্দর সুন্দর চরিত্র উপহার দেবার জন্য টলস্টয়কে তিরস্কার করেন না কেন? তিনি ছিলেন তাঁর শ্রেণীর প্রতি স্নেহপরায়ণ, আমি স্নেহপরায়ণ আমার সমাজের প্রতি। আমার দৃষ্টিতে আজ অসংখ্য মানুষই সুন্দর। প্রামাণ করুন তো এ সত্য নয়।' আসল কথা, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বাস্তবের উপলব্ধির পথে জীবনের সুন্দরকে আবিষ্কার করে সামষ্টিক চেতনার উদ্ভাসের মধ্যে, সংগ্রামের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে। অন্যথায় পূর্বকথিত আশায় দীপ্ত উর্ধায়ন শিল্পীর মনস্কতায় রূপায়িত হত না।

শিল্পীর ব্যক্তি-সত্তার স্বরূপ, তার অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি প্রসঙ্গও বিচার্য। প্রশ্নটা এই প্রকার—কোন মানুষের সংগ্রামী সত্তা এবং শিল্পী-সত্তা কি এক, অভিন্ন, না ভিন্ন, বিচ্ছিন্ন? ব্যক্তি-সত্তার এবংবিধ বিভাজন কি বিজ্ঞানসম্মত? জীবন নিরপেক্ষ শিল্পকর্মের তথাকথিত বিশুদ্ধতা রক্ষণ করার জন্য এবং সমাজ রূপান্তরে শিল্প-সাহিত্যের কার্যকর ভূমিকা অস্বীকার করার জন্য এই ধরণের বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচারিত হয়। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের মধ্যে এই ধারণা

প্রচলিত যে, কোন মানুষ যখন শিল্পকর্মে নিমগ্ন তখন ব্যবহারিক পৃথিবীর দায়-দায়িত্ব তার উপর বর্তায় না। তা যদি না বর্তায় তাহলে ঐ শিল্পকর্ম নির্জীব হতে বাধ্য। মার্ক্স বলেছিলেন, স্বর্ণ-সংস্পর্শে মানুষ আপন সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। তাই বা কেন, ভয়েও হয়। কিন্তু স্বর্ণমৃগয়ায় প্রমত্ত অথবা ভয়ে ভীত মানুষ খণ্ডিত, ক্ষুদ্র। এ মানুষ কোনদিনই ইতিহাস নির্মাণ করে না, সংগ্রামও করে না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ এই মানুষকে স্বীকার করে না, স্বীকার করে না ব্যক্তি-সত্তার পূর্বোক্ত বিভাজন। সামাজিক সম্পর্কের সমগ্রতা মানুষের ব্যক্তিত্বকে গড়ে পিটে তোলে; আন্তর বৈশিষ্ট্যে তা অখণ্ড। তার অখণ্ড সত্তা জনগণের সংগ্রামের অংশীদার হয়, রাস্তায় নামে, মানুষের হাত ধরে, এবং রাস্তার অভিজ্ঞতা তার নিভৃত শিল্পকর্মকে বেগবান করে। আনে অর্থবহ সংকেত; আবার সেই বেগবান শিল্পই রাস্তায় ফিরে আসে সজীব উদ্দীপনারূপে। নাগরিক নেরুদাকে কবি নেরুদা থেকে কোন মতেই বিশ্লিষ্ট করা যায় না। ব্যক্তি-মানুষের জীবনে যা একান্তভাবে ব্যক্তিগত এবং যা সামাজিক, উভয়ের মধ্যে নিবিড় বন্ধন আবিষ্কার ও উন্মোচন করা সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ অতিশয় সচেতন। এই দৃষ্টিতে শিল্পকর্ম ও শিল্পীর সমগ্র জীবনের অখণ্ড সত্তার অভিব্যক্তি। ব্যক্তি-সত্তা ও সমাজ-সত্তার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থিতিশীল অথবা অচল অনড় কিছু নয়; প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে বিরোধ ও বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে ঐ সম্পর্ক নতুন করে নিরূপণ ও সৃষ্টি করতে হয়, হতে থাকে। আর এই হতে থাকার পথেই আজ-এর অন্তর ভেদ করে, সমস্ত প্রতিশ্রুতি ও বৈপরীত্য সহ, আগামী দিনের আবির্ভাব। এই বিবর্তনে শিল্পীর সমগ্র সত্তা বিজড়িত, খণ্ড সত্তা নয়। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ মানুষের শ্রম, সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার বিস্তার ও গুণগত চরিত্র উন্নীত করে তার ব্যক্তি-সত্তায় আনে সর্বজনীনতার ব্যাপ্তি ও দীপ্তি।

প্রসঙ্গতঃ গোর্কির 'লোয়ার ডেপথ্‌স্' নাটকের একটি উক্তি স্মরণে আসছে। সাতিন, সেই স্ব-ঘোষিত খুনী, এক জায়গায় বলছে, 'মিথ্যে বলা, এতো দাসদের ধর্ম আর দাসদের প্রভুদের। সত্য হলো মুক্ত মানুষের ধর্ম।' এই উক্তির মাধ্যমে সাতিন চরিত্র, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মত পাঠক চরিত্রও এক অভাবনীয় ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়েছে। সত্যের পথে, সার্বিক মুক্তির পথে, মানুষের সংগ্রাম চিরন্তন। সেই ঈপ্সিত মুক্তি মানুষ একদিন অর্জন করবে, একদিন আসবে যখন মানুষ দারিদ্র্য, ভয়, অত্যাচার, শোষণ, কুসংস্কার ইত্যাদির

বন্ধন ছিন্ন করে, প্রত্যক্ষ জীবনধারায় সেই সত্য উপলব্ধি করবে, প্রজ্ঞায় হবে বলীয়ান, এই স্বপ্নের মধ্যে মানবচিত্তের মহিমার অভিপ্রকাশ। এই স্বপ্ন থেকে মানুষ কোনদিনই বঞ্চিত হবে না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ আজকের সংগ্রামের মধ্যে আগামী দিনের এই স্বপ্নকে—রোমান্টিক সৃজনধর্মিতাকে—সংহতি দান করেছে।

সেজন্য বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ মানবিক ইতিহাসের ধারায়, আরও নির্দিষ্টভাবে বললে শিল্পকর্মে আত্মোপলব্ধির পথে, এক অপরিহার্য স্তর। যত দিন পর্যন্ত দেশে দেশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রশ্ন থাকবে, থাকবে ধনতন্ত্র-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার, ততদিন পর্যন্ত এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। শুধু তা-ই বা কেন, যেসব দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে আছে নতুন সংস্কৃতি নির্মাণের সমস্যা। সেখানেও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের বিশ্বদৃষ্টি, ত্রি-মাত্রিক চরিত্র সৃষ্টির ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক। নতুন আর্থনীতিক-রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মানবিক চেতনার উদ্বোধন ও সংগঠন—শিল্পেরই দায়িত্ব। বর্তমান জাগতিক পরিবেশে সেজন্যই প্রকৃত শিল্পীর এই আদর্শে দীক্ষিত থাকা প্রয়োজন; এ তাঁর আয়ুধ, সংগ্রামী আয়ুধ। সংগ্রামের কঠোর কঠিন পথেই ভবিষ্যতের অভ্যুদয়। এই তত্ত্বের যুক্তি-সৌধ নির্মাণ, বিস্তার এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে যাঁর অবদান সর্বাধিক, সেই গোর্কির রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই আলোচনার পরিসমাপ্তি টানছি: "সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বলে, জীবনের অর্থ—কর্ম ও সৃষ্টি। এর লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য, আপন স্বাস্থ্য ও পরমায়ুর জন্য, এই পৃথিবীর বুকে জীবিত থাকার অপার সুখানুভূতির জন্য, মানুষের সর্বাধিক মূল্যবান ব্যক্তিগত সম্ভাবনাময়তার নির্বাধ বিকাশ। আর এই পৃথিবীকে মানুষ, তার নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, কর্ষণ করতে চায়, একটি পরিবারে সন্নিবিষ্ট সমগ্র মানবগোষ্ঠীর অপরূপ আবাসস্থল রূপে।"

পূর্বেই বলা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে দীক্ষিত নির্বাচিত কয়েকজন শিল্পীর রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। যাঁরা শুধুই তাত্ত্বিক, শিল্পী নন, এমন লেখকদের রচনা গ্রহণ করা হয় নি। আশা, সংকলিত রচনাগুলো শিল্পীদের মনোদর্পণের কাজ করবে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা

বলাই বাহুল্য। দু-একজন প্রখ্যাত শিল্পীর নাম এখানে অনুপস্থিত; বহু চেষ্টা করেও তাঁদের পূর্ণাঙ্গ কোন রচনা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। কোন কোন পাঠক সম্ভবত হাওয়ার্ড ফাস্টের নাম দেখে বিস্ময়বোধ করবেন; কারণ, দীর্ঘকাল তিনি সাম্যবাদী আন্দোলন থেকে বিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু, যখন সংযুক্ত ছিলেন তখন তিনি আমাদের উপহার দিয়েছিলেন কিছু সংখ্যক মনোহর শিল্পকর্ম। তারই স্মরণে তাঁর রচনা থেকে অংশবিশেষ সংকলিত হয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক পরিতাপের বিষয়, কোন ভারতীয় লেখকের রচনা গ্রহণ করা সম্ভব হল না। সাম্যবাদী আন্দোলনে সামিল অথবা সহযাত্রী বলে যাঁরা চিহ্নিত, তাঁদের এমন কোন পূর্ণাঙ্গ রচনার সন্ধান পাওয়া গেল না যা গুণগত বিচারে এই গ্রন্থে সংকলিত হবার যোগ্য। সেজন্য, আমাদের খেদ থেকে গেল।

প্রবন্ধগুলো অনুবাদ করেছেন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গুণী ব্যক্তি। ব্যক্তিত্বের পার্থক্য অনুযায়ী গদ্যভঙ্গিতে পার্থক্য অনিবার্য। তাতে সামঞ্জস্য বিধানের কোন চেষ্টা করা হয় নি। কোন কোন ক্ষেত্রে দু-একটি শব্দ অদল-বদল করা হয়েছে ইংরেজী শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহারে সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য। আর, বক্তব্যের স্বচ্ছতার দাবিতে কোন কোন অনুবাদকের কিছু বাক্যাংশ পুনর্লিখিত হয়েছে। আশা রাখি, সম্পাদকের এই সামান্য হস্তক্ষেপ তাঁরা সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করবেন। বানানেও সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা হয়েছে, তবু যদি কিছু ব্যতিক্রম চোখে পড়ে তার জন্য সম্পাদকীয় অনবধানতাই দায়ী।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় — অরবিন্দ পোদ্দার

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

ঋণ স্বীকার

Marx and Engels—Literature and Art, 1947

Lenin—On Culture and Cultural Revolution, 1966

Lunacharsky—Lenin on Art and Literature, 1943

Luckas—The Meaning of Contemporary Realism, 1963

Fischer—The Necessity of Art, 1963

Problems of Modern Aesthetics, Moscow, 1969

Art and Society, Moscow, 1968

Craig, David—Marxists on Literature, 1975

সূচী

কেন লিখেছি

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ম্যাক্সিম গোর্কি

মানুষের ব্যষ্টিরূপের যে ইতিহাস তার চেয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক মানুষের শ্রমের ইতিহাস—তার প্রয়াসের ইতিহাস। কেন না মানুষ মরণশীল। একশ বছরের পরমায়ুও সে পায় না। কিন্তু তার প্রয়াসের ফল বেঁচে থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী। বিজ্ঞানের এত দ্রুত উন্নতি ও এমন বিস্ময়কর কীর্তিকলাপের কারণ এই যে, বিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজেদের জ্ঞানরাজ্যের ইতিহাস জানেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে। উভয় ক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষণ, তুলনামূলক পর্যালোচনা ও অনুশীলনের মূলনীতিগত গুরুত্ব রয়েছে। বিজ্ঞানীর মতো শিল্পীরও দরকার হয় কল্পনার, প্রয়োজন হয় স্বজ্ঞা বা সহজ অন্তর্জ্ঞানের। ঘটনা-শৃঙ্খলের মাঝে মাঝে যেসব ফাঁক থেকে যায় তা পূরণ করে কল্পনা আর সহজ জ্ঞান। তাই বিজ্ঞানীরা প্রকল্প **(hypothesis)** ও সিদ্ধান্তের **(theory)** আশ্রয় নিতে পারেন এবং এই সুযোগ রয়েছে বলে প্রকৃতির শক্তি ও স্বধর্ম উদ্ঘাটনের ব্রতে তাঁদের সন্ধানী মন কম-বেশি ঠিক পথে চালিত হয়ে থাকে। প্রকৃতির উদ্ঘাটিত রহস্য ক্রমশ মানুষের নিজের ইচ্ছার অধীনে এসে যায়, সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির। এই 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' বা সংস্কৃতি আমাদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ—তা আমাদের ইচ্ছাশক্তিরই ফল, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিরই দান।

কল্পনা, অন্তর্জ্ঞান ও নিজের মনে 'তৈরী করার' ক্ষমতা না থাকলে সাহিত্যে সৃষ্টি সম্ভব হয় না—সম্ভব হয় না চরিত্র ও 'টাইপ' অঙ্কিত করা। লেখক যখন তার পরিচিত কোনো দোকানদার বা কর্মচারী বা কারখানার

মজুরের কথা বর্ণনা করেন তখন তিনি কেবল মাত্র একজন ব্যক্তিবিশেষের হুবহু ছবিই কম-বেশি সফলতার সঙ্গে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। কিন্তু এরূপ যথাযথ চিত্র নিছক ফটোগ্রাফ হয়েই থাকবে। এই জাতীয় অবিকল ছবির কোনো সামাজিক ও শিক্ষণীয় তাৎপর্য নেই—এ ছবি জীবন ও মানুষ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের প্রসারতা বাড়ায় না, বাড়ায় না গভীরতা।

কিন্তু বিশ পঞ্চাশ বা একশ জন দোকানী বা কেরানী বা মজু'রর মধ্যে যে-সব বিশেষ লক্ষণ বা অভ্যাস, রুচি, অঙ্গভঙ্গী, বিশ্বাস ও চালচলনের মিল রয়েছে তা যদি কোনো লেখক টেনে বার করে নিয়ে আসতে জানেন, অর্থাৎ তারা যে-স্তরের লোক সেই শ্রেণীগত বিশেষত্বগুলি যদি তিনি একটি ব্যক্তির মধ্যেই রূপায়িত করতে পারেন, তবেই তাঁর লেখায় তিনি একটা টাইপ সৃষ্টি করলেন, তবেই তাঁর ছবি হবে সত্যকার শিল্প। লেখক তাঁর দেখা ও জানার ব্যাপকতা ও তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার জোরে অনেক সময় বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা ও মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন। মনের দিক দিয়ে বালজাক্ ছিলেন বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থক, কিন্তু তাঁর লেখায় বুর্জোয়াশ্রেণীর নীচতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকে তিনি নির্দয়ভাবেই উদ্ঘাটিত করেছেন। নিজেদের শ্রেণী ও নিজেদের কালের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ছিলেন এমন লেখকের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। অস্তিত্বের উপযোগী প্রতিবেশ, জীবজন্তুর পুষ্টি, জীব-জগতের বংশবৃদ্ধি ও অস্তিত্ববিলোপের কারণসমূহ পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা তুলে ধরেন এক বেপরোয়া জীবন-সংগ্রামের চিত্র, বিজ্ঞানীর এই কাজের চেয়ে লেখকের কাজের মূল্য কিছু কম নয়।

জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে গড়ে তুলল দুটি প্রচণ্ড সৃজনশক্তি। সে দুই শক্তি হচ্ছে জ্ঞান আর কল্পনা। প্রথম শক্তিটি হচ্ছে প্রকৃতির ও মানুষের সমাজ-জীবনের পর্যবেক্ষণ, তুলনা-মূলক পর্যালোচনা ও বিশদ ব্যাখ্যার ক্ষমতা। এক কথায়, চিন্তা করার ক্ষমতাই জ্ঞান। মূলত কল্পনাও কিন্তু চিন্তা। তবে জগৎ সম্পর্কে কল্পনার এই চিন্তন আশ্রয় নেয় ছবির, সাহায্য নেয় রূপের। অন্যভাবে এ-ও বলা যায়, কল্পনা হচ্ছে বস্তুজগৎ ও প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে বিকাশে মানুষের নিজের গুণাগুণ, নিজের অনুভবন, নিজের অভিপ্রায় আরোপ করার ক্ষমতা। বইএর পাতায় আমরা শুনতে পাই 'বাতাসের আর্তনাদ,'

'কলধ্বনিত নদীর মুখে প্রাচীন কালের কাহিনী,' 'চেয়ারখানা পাতিহাঁসের মতো প্যাঁক প্যাঁক করে উঠল'—দেখতে পাই 'বিষণ্ণ চাঁদের আলো,' 'অরণ্যের ভ্রূকুটি,' শিলাখণ্ড সরিয়ে ফেলার জন্যে জলের কসরৎ,' 'ভীত কম্পিত পাথর তবু নতি স্বীকার করল না,' 'বুট কিছুতেই পা-ছাড়া হতে চাইছে না।' আমরা বলি 'জানালার কাচ ঘেমে উঠেছে' অথচ আমরা বেশ জানি কাচের কোনো ঘর্ম-নিঃসরণের গ্রন্থি নেই।

প্রকৃতিকে আরো সহজভাবে বুঝবার ও জানবার জন্যে এই যে প্রয়াস তাকে বলা হয় এন্‌থ্রোপোমরফিজম্* বা অ-নরে নরত্বের আরোপ। এক্ষেত্রে মানুষ তার চারদিকে যা-কিছু দেখে তাতেই তার নিজের মনের রঙ মাখাতে চায়—চারদিকের সব কিছুর মধ্যে সে নিজের গুণাগুণ দেখতে পায় এবং সব কিছুকে সেইভাবেই দেখতে চায়। বহুরূপী প্রকৃতির মধ্যেই শুধু নয়, নিজের শ্রম ও মননের দ্বারা যে সব জিনিস সে সৃষ্টি করেছে সেই নিজস্ব সম্পদের মধ্যেও সে আপনার স্বধর্ম আরোপ করে খুশি হয়।

এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা এই এন্‌থ্রোপোমরফিজম্ বা নরত্বারোপকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবাস্তর, এমন কি, ক্ষতিকর বলে মনে করেন। কিন্তু এই আপত্তিকারীদেরও বলতে শোনা যায়: 'বরফ আমার কানে দাঁত ফুটিয়ে দিল,' 'সূর্য প্রসন্ন হল,' 'মে মাস এসে গেল' ইত্যাদি। বৃষ্টির হাত পা নেই জেনেও তাঁরা বলেন: 'এবার বৃষ্টি নামতে শুরু করল'—বলে থাকেন: 'কী জঘন্য আবহাওয়া,' অথচ তাঁরাও জানেন যে, নৈসর্গিক ঘটন-অঘটন আমাদের নৈতিক বিচারের ধার ধারে না।

সাহিত্যের মূলগত ধারা বা প্রবণতা হচ্ছে রোমাণ্টিসিজম্ ও রিয়েলিজম্—ভাবানুভাবময়তা ও বাস্তববাদ। মানুষ ও তার সামাজিক আবেষ্টনের অবিকল ও নির্ভেজাল চিত্র পরিবেষণেরই নাম বাস্তববাদ বা রিয়েলিজম্। নানা লোকে রোমাণ্টিসিজমের নানান সংজ্ঞা দিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনোটাই সাহিত্য-বেত্তা সমাজে গৃহীত হবার মতো যথাযথ ও সন্তোষজনক হতে পারেনি। রোমাণ্টিক লেখকদের মধ্যেও দুটো অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিপরীত ধারা দেখা যায়: নিরীহ রোমাণ্টিসিজম্ ও বলিষ্ঠ রোমাণ্টিসিজম্। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লেখকরা

* গ্রীক শব্দ anthropos (মানুষ) ও morphe (রূপ বা ছবি) থেকে এই শব্দটির উৎপত্তি।

কঠোর বাস্তবকে রঙ মাখিয়ে সহজ ও শোভন করে তুলে তাকে মানুষের গ্রহণযোগ্য করতে চান, কিংবা বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষকে তার আপনার মনের জগতের নিস্ফল অন্বেষণের নেশায় মাততে প্রলুব্ধ করেন। তাঁরা মানুষের সামনে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে তোলেন 'জীবনের মারাত্মক প্রহেলিকার' কথা, প্রেমের কথা, মৃত্যুর কথা এবং এমন সব সমস্যার কথা যার সমাধান কোনো কালেই নিছক ভাবন-চিন্তনের দ্বারা সম্ভব হবে না—সম্ভব হবে একমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারাই। অপর পক্ষে বলিষ্ঠ রোমান্টিসিজম্-পন্থী লেখকরা মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে প্রবলতর করার চেষ্টা করেন, কঠোর বাস্তব ও তার সর্বপ্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে বিদ্রোহী করে তুলতে চান।

কিন্তু বালজাক, টুর্গেনিয়েভ, টলস্টয়, গোগোল, লেস্‌কভ্, শেকভ্ প্রমুখ প্রতিভার অপূর্ব সৃষ্টি রোমান্টিক না রিয়েলিস্ট সাহিত্যের কোঠায় পড়ে—সেই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া কঠিন। বড় বড় লেখকদের মধ্যে রিয়েলিজম্ ও রোমান্টিসিজমের সংমিশ্রণ দেখা যায়। বালজাক রিয়েলিস্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনিই আবার **'La Peau de Chagrin'** লিখেছেন। তাঁর এই উপন্যাস রিয়েলিজম্ থেকে বহু দূরে টুর্গেনিয়েভেরও বহু লেখায় রোমান্টিসিজমের প্রভাব রয়েছে। গোগোল থেকে শেকভ ও বুনিন পর্যন্ত অন্যান্য বিখ্যাত রুশ লেখকদের সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়। রিয়েলিজম্ ও রোমান্টিসিজমের সমন্বয় আমাদের দেশের বড় বড় লেখকদের একটা বৈশিষ্ট্য। এই বিশেষত্ব আমাদের সাহিত্যে যে মৌলিকতা ও বলিষ্ঠতার জন্ম দিয়েছে তার ক্রমবর্ধমান প্রভূত প্রভাব পড়েছে সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের উপর। রোমান্টিসিজম্ ও রিয়েলিজমের পারস্পরিক সম্পর্ক কমরেডদের কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যদি তাঁরা 'লেখার ইচ্ছা জাগে কেন' এই প্রশ্নটির সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হন। এই প্রশ্নের দু'টো উত্তর আছে। এর একটা উত্তর আমি পেয়েছি পনের বছরের একটি মেয়ের কাছ থেকে। জনৈক শ্রমিকের কন্যা আমার কাছে এক চিঠিতে জানিয়েছে:

'আমার বয়স মাত্র পনের বছর। এই অল্প বয়সেই আমার মধ্যে লিখবার একটা শক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। এই প্রেরণার মূলে আছে আমার দারিদ্র্য-পীড়িত, ক্লান্তিকর জীবন।'

মেয়েটি তার দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনকে কল্পনায় রাঙিয়ে তোলার জন্যে 'লেখক শক্তির' পরিবর্তে 'লেখার ইচ্ছা' এই কথা বললেই ভালো করত। এখানেই

আর একটি প্রশ্ন এসে দেখা দেয়: দারিদ্র্য-পীড়িত যার জীবন, তার লেখার বিষয়বস্তু কী হবে?'

এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছে ভলগা অববাহিকা, উরল অঞ্চল ও সাইবেরিয়ার সংখ্যালঘু জাতিগুলি। হাল আমলেও এদের অনেকরই আদৌ কোন লিখিত ভাষা ছিল না। কিন্তু হাজার বছরেরও পূর্ব থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন অরণ্য, জলাভূমি ও মরুবাসী লোকেরা এবং উত্তরের তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের দারিদ্র-পীড়িত ক্লান্ত জীবনকে সরস সুন্দর করে এসেছে গানে গানে, রূপকথায়, বীরের কীর্তি গাথায়, দেবতাদের উপাখ্যানে। শেষোক্ত পুরাণ কাহিনীকে প্রধানত 'ধর্মের ব্যাপার' বলে অভিহিত করা হয়; কিন্তু বস্তুত সেগুলি শিল্প সৃষ্টি।

আমার পনের বছর বয়সের ঐ পত্রলেখিকার সত্যি যদি লেখার শক্তি থাকে —অকপটে তার সে-শক্তি আমি কামনা করছি—তবে খুব সম্ভব সে তথাকথিত রোমাণ্টিক লেখাই লিখবে; কল্পনার মনোরম জাল বুনে বুনে তার ঐ 'দারিদ্র্য-পীড়িত ক্লান্তিকর' জীবনটাকে শোভন সুন্দর করে দেখতে চাইবে, মানুষ আসলে যা, তাকে তার চেয়েও সে ভালো বলে চিত্রিত করবে। গোগোল **'How Ivan Ivanovich Quarrelled with Ivan Nikiforovich', 'Old World Gentry'** ও **'Dead Souls'** লিখেছেন; আবার তিনি **'Taras Bulba'** ও লিখেছেন। প্রথম তিনটি লেখায় গোগোল তাঁর চরিত্রগুলিকে 'নিষ্প্রাণ' মানুষ রূপে দেখিয়েছেন। ভয়ংকর হলেও এ চিত্র খাঁটি চিত্র। ঐ জাতীয় মানুষ তখনও ছিল, আজও আছে। গোগোল এখানে রিয়েলিস্ট।

'Taras Bulba'-তে গোগোল জাপোরোজিয়ে কসাকদের ধর্মভীরু ও অমিতবলশালী নাইটরূপে চিত্রিত করতে গিয়ে লিখেছেন, তারা বল্লমের আগায় একটা আস্ত মানুষ গেঁথে নিয়ে তাকে উঁচুতে তুলে ধরে রাখতে পারত। একথা লিখতে গিয়ে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, কাঠের বর্শাদণ্ড অতখানি ভার সইতে না পেরে নিশ্চয় ভেঙ্গে যাবে। আসলে জাপোরোজিয়ে কসাক বলে কেউ ছিল না কোনোদিন। তাদের সম্পর্কে গোগোলের ঐ গল্প হচ্ছে একটা সুন্দর অ-সত্য। এই গল্পটিতে এবং তাঁর এই জাতীয় আরো অনেক গল্পে গোগোল হচ্ছেন রোমান্টিসিজম্-ধর্মী। তাঁর রোমাণ্টিসিজমের দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণ বোধ হয় এই যে, 'জীবন্মৃত' মানুষের 'দারিদ্র্যপীড়িত ক্লান্তিকর' জীবন দেখে দেখে তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

এতক্ষণ যা বলে আসছি তা থেকে আমি সাহিত্যে রোমান্টিসিজম্ অপরিহার্য বলে মনে করি—এ-কথা বোঝায় কি? হাঁ, তাই বোঝায়। আমি সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের প্রয়োজন স্বীকার করি—তা স্বীকার করি একটি শর্তে। এই রোমান্টিসিজমের সঙ্গে আরো অন্যান্য জিনিস আমাদের যোগ করে দিতে হবে।

আর একজন পত্রলেখক—সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ শ্রমিক—আমায় লিখে পাঠিয়েছেন: 'জীবনে এত বেশি দেখেছি এত কিছু বুঝেছি যে, আমি না লিখে থাকতে পারছি না।'

এক্ষেত্রে লেখার ইচ্ছার মূল রয়েছে জীবনের দারিদ্র্যের মধ্যে নয়—জীবনের সম্পদের মধ্যে। অভিজ্ঞতার আধিক্য জন্ম দিয়েছে যে-প্রেরণার তার চাপে দশজনকে নিজের কথা না শুনিয়ে আর থাকা যায় না। আমার যুবক পত্রলেখকদের অধিকাংশই লিখতে চায়। তারা অনেক দেখেছে, অনেক বুঝেছে। সে সব জ্ঞান অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তারা আর নীরব থাকতে পারছে না। সম্ভবত এদের মধ্য থেকেই বহু বাস্তববাদী লেখক আত্মপ্রকাশ করবে। মনে হয়, তাদের বাস্তববাদে কিছু পরিমাণ ভাবকল্পনার মেশাল থাকবে। এই সংমিশ্রণ আমাদের এই নতুন সমাজের সুস্থ আত্মিক জাগরণের যুগে অনিবার্য ও সমর্থন যোগ্য বলে আমি মনে করি।

'আমি লেখক হলাম কেন?' এই প্রশ্নের জবাবে আমার বক্তব্য এই: এক 'দারিদ্র্যপীড়িত ক্লান্তিকর' জীবনের চাপে পড়ে আমি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম—জীবনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কথা না বলে থাকা যায় না বলেও কলম ধরেছিলাম। প্রথমোক্ত কারণে 'দারিদ্র-পীড়িত ক্লান্তিকর' জীবনে কল্পনার খাদ মিশিয়ে লিখলাম 'The Falcon and the Hedgehog' 'Legend of the Burning Heart,' 'Stormy Petret' জাতীয় লেখা এবং দ্বিতীয় কারণে আমার কলম থেকে বার হল 'Twenty-six Men and a Girl' ও 'The Orlovs'-এ মতো বাস্তব চরিত্রের গল্প।

একথা নিঃসংশয়ে বলতে পারা যায়, আমাদের সাহিত্যে এখনও সেই ধরনের রোমান্টিসিজমের আবির্ভাব ঘটেনি, যা বাস্তবের দিকে একটা সৃজনী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলে, যা বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা ও শ্রমের জয়গান করে, যা জীবনের নব নব রূপ সৃষ্টির কথা শোনায় এবং সেই সঙ্গে পুরাতন জগতের কুফলগুলিকে ঘৃণা করতে শেখায়—ঘৃণা করতে শেখায় অতীতের সেই অকল্যাণকর উত্তরাধিকার

যা কাটিয়ে উঠতে আজ আমাদের কত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কত না দুঃখকষ্ট বরণ করে নিতে হচ্ছে।

আমার যৌবনকালে জীবন সম্পর্কে আমি কোনো নালিশ জানিয়েছি বলে মনে পড়ে না। তখন যাদের মধ্যে আমার জীবন কেটেছে তাদের কিন্তু বিস্তর হা-হুতাশ করতে শুনেছি। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, সে সব হা-হুতাশের পেছনে ছিল ধূর্তামি ; পারস্পরিক সাহায্যের অনিচ্ছায় কথাটা গোপন রাখার জন্যেই তারা অভিযোগ আর অসন্তোষের আশ্রয় নিত। আমি সেই পন্থা কখনও অনুসরণ করিনি। পরে আমি একথা বেশ ভালোভাবেই বুঝে ফেলেছিলাম যে, জীবন নিয়ে যারা ঘ্যানঘ্যান করে সব চেয়ে বেশি, প্রতিরোধের ক্ষমতা তাদেরই কম—তারাই কাজ করতে পারে না বা কাজ করতে চায় না—অপরের ঘাড় ভেঙ্গে তারাই আরামে থাকার ফিকির খোঁজে।

শঙ্কিত জীবনের প্রচুর অভিজ্ঞতা আমার আছে। আজ ঐ শঙ্কাকে আমি বলি 'অন্ধের আশঙ্কা।' অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে আমার জীবন কেটেছে। ছোটো বেলা থেকেই দেখে এসেছি মানুষের অবোধ্য বিদ্বেষ ও অকারণ নিষ্ঠুরতা। দেখে বিস্মিত হয়েছি, কেউ দুরূহ বোঝার ভারে ভেঙ্গে পড়ছে, কেউ বা ঐশ্বর্যের কোলে গড়াগড়ি দেয়। শৈশবকাল থেকেই দেখে আসছি, যে সব ধর্মপরায়ণ লোক নিজেদের যত বেশি ভগবানের কাছাকাছি বলে মনে ভাবেন, তাঁরাই তত বেশি দূরে সরে আছেন—দূরে সরে আছেন সেই সব লোকের কাছ থেকে যারা তাদের জন্যেই খেটে মরে এবং এই মেহনতকারীদেরই উপর তাঁদের দাবীদাওয়া ততই বেশি নিষ্ঠুর। সাধারণভাবে জীবনের নীচতা ও ক্রূরতার দিক আপনাদের চেয়ে আমি অনেক বেশি দেখেছি। আপনাদের চেয়ে ঢের বেশি জঘন্য রূপ দেখার সুযোগ পেয়েছি। আপনারা আজ যে পাতিবুর্জোয়াদের দেখছেন, তারা বিপ্লবের ফলে ভীতিবিহ্বল হয়ে আছে, নিজেদের স্বভাব-সংস্কার অনুযায়ী যা তারা চায় সেই অধিকার আদৌ পাবে কিনা সে বিষয়ে তাদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। আর আমার যুগে যে পাতি-বুর্জোয়াদের আমি দেখেছি তারা কিন্তু তখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করত, তারা ঠিক পথেই সৎ জীবন যাপন করছে এবং সেই নিরুপদ্রব ভালো জীবনযাত্রা একেবারে পাকাপোক্ত ও চিরস্থায়ী।

সেই সময়ের আগেই আমি বিদেশী উপন্যাসগুলির অনুবাদ পড়তে আরম্ভ করেছি। সেই নির্বিচার অধ্যয়নের কালে হাতে এসে গেল ডিকেন্স ও বালজাকের অপূর্ব গ্রন্থরাজি। এইনসওয়ার্থ, বুলওয়ের-লিটন ও ডুমার ঐতিহাসিক নভেল-

গুলিও পড়ে ফেললাম। এই সব উপন্যাসের মধ্যে পেলাম বলিষ্ঠ লেখনীর মুখে সুচিত্রিত এক প্রবল-ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন মানুষের পরিচয়—এদের আনন্দ আলাদা ধরনের, এদের দুঃখভোগও ভিন্ন জাতের—এদের সংঘর্ষের কারণ এদের সুদৃঢ় অভিমতের সংঘাত। এদিকে আমার চারপাশে তখন যে-সব নরনারী দেখেছি তাদের কত ছোটো মন—তারা যৎকিঞ্চিৎ পাওয়ার জন্যে কত লোভী, কী রকম হিংসুক; সামান্য কারণেই রেগে যায়, ঝগড়া বাধায় বা আদালতে নালিশ রুজু করে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে, যে-হেতু ঐ প্রতিবেশীর ছেলে ঢিল ছুঁড়ে তার মুরগীর একটা ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছে কিংবা তার জানলার একটা কাচ ভেঙে ফেলেছে। কেক্ একটুখানি কড়া হয়ে গেলে বা মাংস কিঞ্চিৎ বেশি সিদ্ধ হলে বা কড়াই থেকে দুধ খানিক উথ্‌লে পড়লে আর রক্ষে নেই—কেউ হয় অগ্নিমূর্তি, কারো ক্ষোভের অন্ত থাকে না। মুদী চিনির দর পাউণ্ড প্রতি এক ফার্দিং বেশি চাইলে বা বস্ত্র-বিক্রেতা প্রতিগজ রঙীন কাপড়ের দর এক ফার্দিং বাড়িয়ে দিলে তারা ঘন্টার পর ঘন্টা তা নিয়ে হা-হুতাশ করতে পারে। পাড়াপড়শীর ছোট-খাটো আপদে-বিপদে তারা বেশ মজা উপভোগ করে, অথচ মনের কথা গোপন রেখে মুখে জানায় সহানুভূতি। আমি ভালোভাবেই বুঝে নিয়েছিলাম, পাতি-বুর্জোয়া আকাশের সূর্য হচ্ছে কোপেক।* এই সব লোকের ছোটোখাটো জঘন্য ঝগড়াবিবাদের ইন্ধন যোগায় ঐ কোপেক। বাসনকোসন, চায়ের পাত্র, গাজর, মুরগীর ছানা, কেক, জন্মদিন, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া, খেয়ে খেয়ে যখন কিছুতেই আর পেটে ধরে না তখনই থামে, বমি করে চারদিক ভাসিয়ে পশুর মতো অবস্থায় না পৌঁছান পর্যন্ত মদ খায় গেলাসের পর গেলাস—মোটামুটি এই তো তাদের জীবনের কাঠামো। এদের মধ্যে এদের সঙ্গে আমি বাস করেছি। মাঝে মাঝে এই কুশ্রী জীবন আমার মনে অপরিসীম বিরক্তির ভাব জাগাত, শ্রান্তিতে আর নিরাশায় ঘুমিয়ে পড়তাম। কখনো আবার ঐ জীবনই আমাকে চাঙ্গা করে তুলত, বিদ্রোহী হবার জন্যে ভেতরে ভেতরে প্ররোচিত করত।

কখনো বিরক্তির ভাব, কখনো বিদ্রোহী হবার বাসনা। মাঝে মাঝে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে দূরে সরে পড়ার চেষ্টা করতাম। কত দিন রাত্রি বেলায় ছাদের উপরে উঠে গিয়ে ন্যাকড়া আর জঞ্জাল দিয়ে চিমনির মুখ বন্ধ করে এসেছি, উনোনের উপর ফুটন্ত ঝোলের মধ্যে এক মুঠো লবণ ছেড়ে দিয়েছি, কাগজ দিয়ে ফুঁ দেওয়ার নল তৈরী করে তার সাহায্যে বড় ঘড়ির

* রাশিয়ার তাম্রমুদ্রা।

টিক্-টিক্ করে চলার কাজে ধুলোর বাধা ছড়িয়ে দিয়েছি—এক কথায় তখন এমন সব কাজ করেছি যাকে এখন লোকে বলবে গুণ্ডামি। অথচ তা-ই আমি করেছি, কারণ আমি যে বেঁচে আছি সেই কথাটাই আমি অনুভব করতে চেয়েছিলাম। ও-সব উৎপাত সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোনো পথ তখন জানা ছিল না, আর কোনো উপায়ে নিজেকে জানাতে পারছিলাম না যে, হাঁ আমি বেঁচেই আছি। সে সময় আমার মনে হত, আমি যেন এক বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি—পথ হারিয়েছি ক্ষুদ্র ও অপুষ্ট ঝোপঝাড়ের এক দুরধিগম্য রাজ্যে—যেন এক বদ্ধ জলাভূমিতে হাঁটু-সমান কাদার মধ্যে আমি আটকে গেছি।

একটি ঘটনা এখনো মনে আছে। আমি যে-রাস্তায় থাকতাম সে-রাস্তা দিয়ে প্রহরীবেষ্টিত একদল বন্দীকে নিয়ে যাচ্ছিল। কোন্ এক কারাগার থেকে তাঁরা আসছেন, যাচ্ছেন একটা স্টিমারে উঠতে। সেই স্টিমার তাঁদের নিয়ে যাবে সাইবেরিয়ায়—ভলগা ও কামা নদীর তীরে কোনো এক জায়গায়। এই বন্দীর দল সব সময়েই আমার মনটাকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে নাড়া দিয়ে যেতেন। তাঁরা সতর্ক পাহারার অধীন, কারো কারো হাতে পায়ে শেকল পর্যন্ত দেখেছি। তা সত্বেও তাদের আমি হিংসা করতাম এই কারণে যে, তবু তাঁরা একটা কিছু করছেন—অন্তত একটা কোথাও যাচ্ছেন। আর আমি? আমি যেন ইটের তৈরী মেঝের নোংরা হেঁসেলের ভাঁড়ারে একা-একা বাস করছি এক নেংটি ইঁদুর। একদিন পায়ের শেকলের ঝন্ঝন্ আওয়াজ তুলে বড় এক দল কয়েদী চলেছিল রাস্তা দিয়ে। এই দলের পার্শ্বভাগে—ফুটপাথের কাছে—দু'জন কয়েদীর হাত-পা দেখলাম শেকলে বাঁধা। এদেরই একজন দেখতে কী ভয়ংকর! এই দীর্ঘাকৃতি জোয়ান লোকটার এক-গাল কালো দাড়ি, চোখ-দুটো তার ঘোড়ার মতো, কপালের উপরে লম্বা একটা কাটার দাগ, একটা কান কেটেছিঁড়ে বিকৃত হয়ে গেছে। আমি ফুটপাথ ধরে চলেছি আর কেবলি তাকাচ্ছি এই লোকটার দিকে। হঠাৎ লোকটা পরম আহ্লাদে গলা ছেড়ে ডাকল আমায়: 'ওহে ছোক্‌রা, এসো এসো আমাদের সঙ্গে চলো।'

মনে হল ঐ ক'টি কথা দিয়ে সে যেন আমার একখানা হাত ধরে ফেলেছে।

আমি একদৌড়ে তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু প্রহরীদের একজন আমায় গালাগাল দিয়ে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল। পাহারাওয়ালা আমাকে গায়ের জোরে অমন করে সরিয়ে না দিলে আমি বুঝি সেদিন ঐ ভয়ংকর

লোকটার সঙ্গী হতাম, নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো তার পিছনে পিছনে চলে যেতাম ; কারণ সে ছিল অদ্ভুত, সে আমার পরিচিত জগতের আর কারো মতোই নয়—ঐ দুর্দান্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষটি আমাকে বুঝি এক নতুন জীবনের মধ্যে নিয়ে যেতে পারবে। পরে বহুকাল ঐ লোকটার কথা ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি সেই খোশ-মেজাজী লোকটির সহজ কণ্ঠস্বর। আমার স্মৃতির কোঠায় তার সঙ্গে মিলিত আছে আর একটি লোক—তার প্রভাবও কোনো অংশে কম নয়। আমি একখানা মোটা বই পেয়েছিলাম যার প্রথম দিকের কয়েকটি পাতা হারিয়ে গিয়েছিল। এই বইখানা পড়তে আরম্ভ করলাম। একটি গল্প বাদে সে বইএর আর কোনো গল্প আমি বুঝে উঠতে পারিনি। সে এক রাজার কাহিনী। রাজা এক সাধারণ ভদ্রলোককে অভিজাত শ্রেণীভুক্ত করে নেবার প্রস্তাব করতেই তিনি তার জবাব দিলেন কবিতায় :

'...যে শ্রেণীর লোক আমি সেই শ্রেণীতে থাকতেই চাই, মরতেও চাই আমার সেই পরিচয় নিয়েই। আমার পিতাও তাই ছিলেন, তার ছেলেও তা-ই থাকবে। কারণ নিম্নতর বংশে থেকে কোনো মহৎ কাজ করলে তার মূল্য, তার কৃতিত্ব উচ্চ বংশে থেকে সেই কাজ করার চেয়ে ঢের বেশি, ঢের বড়।'

আমার কপিবুকে এই অদ্ভুত কবিতাটি আমি টুকে রেখেছিলাম। বহুকাল ঐ লাইন কয়টি আমার কাজে লেগেছে—পর্যটকের কাছে তার লাঠির মতো। আমার তখনকার ধারণায় 'চমৎকার ভদ্রলোক' বলতে যাদের বোঝাত সেই পাতি-বুর্জোয়াদের হিতোপদেশের হাত থেকে, কত প্রলোভনের মুখ থেকে আত্মরক্ষার কাজে ঐ কবিতাটি ছিল আমার বর্ম। জীবনের প্রারম্ভে সম্ভবত অনেকেরই ভাগ্যে এ জাতীয় দু'চারটে শব্দ-সম্পদ জুটে যায়। বাতাসের ঠেলায় পালের বুক যেমন ফুলে ওঠে তেমনি ঐ জাতীয় টুকরো ভাষা তরুণ মনের কল্পনা-ভাবনা এক ইচ্ছা-শক্তির বেগে আবেগে ভরিয়ে তোলে।

দশ বছর পরে আমি জানতে পেরেছিলাম, ঐ কবিতাটি নেওয়া হয়েছে সেক্সপীয়রের সমসাময়িক লেখক ষোড়শ শতাব্দীর রবার্ট গ্রীনের নাটক 'George-a-Green, the Pinner of Wakefield'—থেকে। রুশ ভাষায় ঐ নাটকটির নামকরণ হয় 'Comedy about the Merry Archer George Greene and Robin Hood.' এই আবিষ্কারে অত্যন্ত খুশি

হলাম। সাহিত্যের দিকে আমার আগ্রহ আরো বেশি বেড়ে গেল। বুঝলাম এই কঠোর কঠিন জীবনে সাহিত্য সব সময়েই মানুষের সত্যিকার বন্ধু, তার প্রকৃত সাহায্যকারী।

মনে রাখবেন সেই সময়ে আমার মতো ছেলেরা ছিল নিঃসঙ্গ একলা নেকড়ের মতো—তারা ছিল যেন সমাজ-বিমাতার সৎ ছেলের দল। আর আপনাদের কালে আপনারা—আপনাদের মধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে—যে শ্রমিক শ্রেণীর সন্তান সেই শ্রেণী তার নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন, সেই শ্রেণীর হাতেই আজ শাসনের বল্গা, এবং এই শ্রমিক শ্রেণী আজ দ্রুতগতিতে ব্যক্তিমানুষের ফলপ্রসূ কাজের প্রকৃত মূল্য দিতে শিখছে। আপনাদের শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্রে আপনাদের স্ব স্ব ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশে আপনাদের নিজের গবর্নমেন্ট সাহায্য করতে পারেন এবং নিশ্চয়ই করবেন—ইতিমধ্যে ক্রমশ তা করছেনও।

বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি ও কারিগরির ক্ষেত্রে মানুষের যে সব সত্যকার সুন্দর, মূল্যবান ও চিরকালের কল্যাণকর সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে সে সব সৃষ্টি করেছেন যাঁরা, তাঁদের কী অবিশ্বাস্য প্রতিকূল অবস্থার অধীনে থেকে সমাজের অপরিসীম অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে—ধর্মযাজকদের প্রচণ্ড বিরোধিতা, পুঁজিপতিদের স্বার্থোদ্ধারের প্রচেষ্টা এবং বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার 'পৃষ্ঠপোষক শ্রেণীর' অতি লোভী চাহিদার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই ইতিহাস আপনাদের জানতে হবে। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, সংস্কৃতি স্রষ্টাদের মধ্যে অনেক সাধারণ মজুরও ছিলেন—যেমন, বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী ফ্যারাডে ও এডিশন্; সুতা তৈরীর যন্ত্রের অবিষ্কারক আর্ক-রাইট ছিলেন নাপিত; কামার বেয়রনার পালিসি মৃৎশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা; সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপীয়ার একজন সাধারণ অভিনেতা মাত্র ছিলেন। মলিয়েরও তাই। এমন শত-শত দৃষ্টান্ত দেখান যায়।

মানুষের এই সব অক্ষয় সম্পদ যাঁরা সৃষ্টি করে গেছেন তাঁদের সামনে কিন্তু আমাদের কালের মতো এত বড় বড় জ্ঞান-ভাণ্ডার, এত বেশি কারিগরি বিদ্যার সুযোগসুবিধা ছিল না। এখানে, আমাদের এই দেশে, শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতির কাজ আজ কত সহজ হয়ে গেছে। আমাদের রাষ্ট্রের বিঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে জনগণকে অযৌক্তিক মেহনতের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা। শ্রমশক্তির নিষ্ঠুর শোষণ-ব্যবস্থায় একদিকে সৃষ্টি হয় এমন একটি ধনিক শ্রেণীর যারা দ্রুত অধোগতির পথে

নেমে যায় এবং যার আর একদিকে শ্রমজীবী শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার বিপদ ঘনিয়ে আসে।

কেমন করে আমি লিখতে শিখলাম, এবার সেই প্রশ্নেরই জবাব দেব।

আমার উপলব্ধি আর অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছে দু'ভাবে—সরাসরি বাস্তব জীবন থেকে আর গ্রন্থ অধ্যয়নে। প্রথমোক্ত জ্ঞানকে যদি বলি কাঁচা মাল, শেষোক্ত জ্ঞানলাভকে বলতে পারি কারখানার আধা-পণ্য। কথাটি সহজবোধ্য করার জন্যে আরও স্থূলভাবে বলা চলে, প্রথম ক্ষেত্রে আমার সামনে আমি দেখেছি একটি ষাঁড় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখেছি সেই ষাঁড়েরই চামড়া—অতি সুন্দরভাবে তৈরী করা। বিদেশী সাহিত্যের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম, বিশেষ করে ফরাসী সাহিত্যের কাছে।

আমার পিতামহ ছিলেন যেমনি কঠোর প্রকৃতির লোক, তেমনি কৃপণ। বালজাকের **'Eugenie Grandet'** উপন্যাসখানি পড়ার পরে ঐ ঠাকুরদাদাকে যেভাবে দেখলাম ও বুঝলাম সেভাবে তাঁকে এর আগে কোনো দিন দেখিওনি, বুঝিওনি। ওজেনির পিতা গ্রোদে ছিলেন কৃপণ ও কর্কশ স্বভাবের লোক। মোটামুটিভাবে তিনি আমার পিতামহেরই মতো। কেবল একটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। আমার ঠাকুরদার মতো তিনি অতটা বুদ্ধিমান নন, অতখানি উপভোগ্য নন। পিতামহকে আমি ভালো চোখে দেখতাম না। কিন্তু ঐ ফরাসী পিতা মানুষ হিসেবে যে আমার বুড়ো রুশ-দাদুর চেয়ে খাটো ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য এতে করে তাঁর সম্পর্কে আমার মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু এ-যেন আমার কাছের এক মস্তবড় আবিষ্কার। সাহিত্যের কী অদ্ভুত ক্ষমতা! আমার একান্ত পরিচিত একজন লোকের সম্পর্কে এর আগে আমি কোনোদিন যা দেখিনি বা লক্ষ্য করিনি, একখানি বই তাঁর সেই অপরিজ্ঞাত দিকটা আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিল।

জর্জ এলিয়টের **'Middlemarch'** এবং অয়ারবাক্ ও স্পিল হেগেনের বইগুলি থেকে বুঝতে পারলাম, ইংলণ্ড ও জার্মানীর লোকের জীবনযাত্রা ও নিশ্‌নি নভগোরোদ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য যৎসামান্য —অবস্থাও প্রায় সমান বলা যায়। তাদের আলাপ-আলোচনার বিষয়গুলিও প্রায় একই ধরনের। তারাও তাদের ইংরাজী বা জার্মান কোপেক নিয়ে কচকচি করে। তারাও বলে থাকে, ঈশ্বরে ভয় ও ভক্তি থাকা

উচিত। তারাও ঈশ্বরকে ভালোবাসার কথা বললেও আমার প্রতিবেশীদের মতোই পরস্পরকে আদৌ দেখতে পারে না—বিশেষ করে তাদের থেকে কোনো কোনো বিষয়ে আলাদা ধরনের লোকদের তারা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না। রাশিয়ার অধিবাসী ও বিদেশীদের মধ্যে আমি খুঁজছিলাম মিল নয়—অমিলের দিক; কিন্তু সন্ধানের ফলে পেলাম শুধুই মিল।

আমার পিতামহের সর্বস্বান্ত ব্যবসায়ী বন্ধু আইভান চারভ ও ইয়াকভ কটেলকনিভও থ্যাকারের সুবিখ্যাত 'ভ্যানিটি ফেয়ার' উপন্যাসের চরিত্রগুলির মতো একই বক্তব্য একই ধরনে বলতেন। আমি তখন বুক অব সামস্ (বাইবেল) পড়তে শিখেছি। কবিত্বময় ভাষার জন্যে ঐ বইখানি আমার বড় ভালো লাগত। ইয়াকভ কটেলনিকভ, আমার ঠাকুরদা এবং আর সব বুড়োরা যখন পরস্পরের কাছে তাঁদের ছেলেপিলেদের সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন, তখন আমার মনে পড়ত রাজা ডেভিডের কথা—ডেভিড তাঁর বিদ্রোহী পুত্র এ্যাব-সালমের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন। ঐ বুড়োরা যখন বলাবলি করতেন, আজকালকার লোকেরা, বিশেষভাবে আজকালকার ছেলেছোকরা, তাঁদের আমলের তুলনায় খারাপ—এ-যুগের লোক বেশি অলস, বেশি বোকা, বেশি অবাধ্য বেশি অধার্মিক, তখন তাঁরা সত্যি কথাটাই বলতে চাইতেন না বলে আমার মনে হত। ডিকেন্সের উপন্যাসের ভণ্ড চরিত্রগুলিও ঠিক ঐভাবে ঐ-সুরেই কথাবার্তা বলে।

আমার অধ্যয়নের কোনো পদ্ধতি বা কোনো নিয়ম ছিল না। হাতের কাছে যখন যা পেতাম তাই পড়ে ফেলতাম। আমার মনিবের ভাই ভিক্টর সার্জিয়েভকে দেখেছি জাভিয়ে দ্যমঁৎপো, গাবোরিও ও বুভিয়ে-এর জনপ্রিয় নভেলগুলি পড়তে ভালোবাসতেন। এ-সব লেখকদের বই শেষ করে তিনি এক-আধখানা রুশীয় গ্রন্থও পড়ে দেখতেন—যাঁদের 'নিহিলিস্ট' বলা হয়ে থাকে সেই বিপ্লবীদের বিকৃত ও ব্যঙ্গাত্মক চিত্রে ভরা এ-সব বই। আমিও এই বইগুলি উপভোগ করতাম এই কারণে যে, যাঁদের মধ্যে আমি বাস করছিলাম তাঁদের সঙ্গে ঐ-সব গ্রন্থে বর্ণিত লোকগুলির কোনো মিল নাই—তাঁরা আলাদা জাতের লোক; আমায় একদা সঙ্গী হবার জন্যে ডাক দিয়েছিল যে কয়েদীটি বরং তারই সঙ্গে এঁদের অনেকটা মিল আছে বলে মনে হত আমার। ঐ-সব বইএর লেখকরা বিপ্লবীদের বিশ্রী বিকৃত চিত্র আঁকতেন। তাঁদের লেখা

পড়ে বিপ্লবীরা যে সত্যি কী চান তা আমি বুঝে উঠতে পারতাম না। ঐ-লেখকরাও তো তা-ই চেয়েছিলেন।

হঠাৎ হাতে পড়ল পমিয়ালভ্স্কির গল্প 'Molotov'' ও 'Little Men's Luck.' পমিয়ালভ্স্কির লেখায় পাতি-বুর্জোয়া জীবনের 'দারিদ্র্য ও অবসাদ' ও পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণীর কাঙালপনার চিত্র দেখার পরে আমি মনের গভীরে উপলব্ধি করতে পারলাম, ভয়ংকর নিহিলিস্টরা আর যাই হক না কেন মাননীয় মলোটভের চেয়ে বড়ো জাতের মানুষ।

বিদেশী সাহিত্য থেকে আমি তুলনামূলক বিচারের প্রচুর উপাদান পেলাম। বিদেশী সাহিত্যের অপূর্ব লিপিকুশলতায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সে সাহিত্যে পেলাম এমন নিখুঁত ছবি এমন জীবন্ত চিত্র যাদের হাত বাড়ালেই যেন ছুঁতে পাই। সেই সব চরিত্র রুশদের চেয়ে বেশি কর্মতৎপর—তারা কথা বলে কম, কাজ করে বেশি। লেখক হিসাবে আমার উপর অকৃত্রিম ও অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ফরাসী সাহিত্যের ত্রয়ী প্রতিভা স্তাঁদাল, বালজাক ও ফ্লবেয়র। এই তিন বিরাট প্রতিভার বইগুলি পড়বার জন্যে প্রথম ব্রতীদের আমি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। তাঁরা তিনজন রূপ ও লিপি-চাতুর্যের শ্রেষ্ঠ সাধক। রুশ সাহিত্যে এখনও তাঁদের মতো বড় শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেনি। তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টির আস্বাদ গ্রহণ করেছি অনুবাদ থেকে; কিন্তু তাতেও ঐ ফরাসী শিল্পীদের ভাষার উপর অদ্ভুত দক্ষতা ও অপূর্ব লিপি-কুশলতা উপলব্ধি করতে কোনো বাধা হয়নি। মেন-রীড, কুপার, গুষ্টাভ আমার্ড ও পঁ সঁ দ্যু তেরাই-এর বিস্তর নিরস লেখা পড়ে পড়ে ঐ তিন ফরাসী প্রতিভার গল্পগুলি আমার কাছে মনে হল যেন এক ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি।

ফ্লবেয়র 'A Simple Heart' গল্পটি পড়ার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। ছুটির আমোদ-আহ্লাদে মত্ত জনতার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সন্ধ্যেবেলা উঠে গেছি একটা কুঁড়ে ঘরের ছাদের উপর। ফ্লবেয়র-এর গল্পটি আমায় পেয়ে বসেছে, একেবারে অভিভূত করে দিয়েছে—এ-দুনিয়ায় তখন আমার আর কিছু জানার নেই, আর কিছু শোনার নেই। ছুটির দিনের আনন্দ-উৎসবের কলকোলাহলকে আড়ালে ফেলে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটি অতি-সাধারণ মেয়ের মূর্তি—সেই পরিচারিকা মেয়েটি তখন কোনো অসমসাহসের কাজও করছে না, কোনো লোমহর্ষক পাপকার্যের জন্যেও উদ্যত হয়নি। একটি অতি-সাধারণ মেয়ের নীরস জীবনের গল্প বলতে বসে একজন লোক সহজ ও

সুপরিচিত কতকগুলি শব্দ পাশাপাশি সাজিয়ে কেন যে আমায় অমন করে মুগ্ধ করে ফেলল, সে কথা বোঝা কঠিন। সেই লেখার মধ্যে যেন কী এক যাদু আছে —নিজের অজ্ঞাতসারেই বুঝি কখন সেই গল্পের পাতাগুলি আলোর কাছে তুলে ধরেছি এই আশা নিয়ে যে, ঐ লাইনগুলির মধ্যে কোথাও না কোথাও নিশ্চয় লুকিয়ে আছে লেখকের যাদুকরী কলাকৌশল।

বিস্তর বই পড়লাম যাতে কেবল রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড ও খুন-খারাপির বিবরণ। তারপরেই হাতে পেলাম স্তঁাদাল-এর ইতালীয় গল্পগুলি। এখানেও সেই যাদুকরী শক্তির পরিচয় পেলাম। লেখক এখানে ছবি এঁকেছেন নিষ্ঠুর মানুষের, প্রতিহিংসাপরায়ণ নরহত্যাকারীদের। তবু সেই গল্পগুলি পড়ে আমার মনে হল যেন সাধু ব্যক্তিদের জীবন কাহিনী শুনছি, যেন 'ম্যাডোনার স্বপ্নকথা' জানছি—চিরদণ্ডিত নিপাতগ্রস্তদের আর্তনাদ শুনতে শুনতে নরকের মধ্য দিয়ে ম্যাডোনার পরিভ্রমণের বিবরণ পড়ছি।

সর্বাধিক মুগ্ধ হলাম বালজাকের 'La Peau he Chagrin' পড়ে। লগ্নিকারবারীর বাড়ির হৈ-হুল্লোড়ের দৃশ্য। এক সঙ্গে বিশজন লোক কথাবার্তা বলছে। সে এক শব্দময়ী বিশৃঙ্খলা। বহু লোকের এককালীন কথাবার্তার সম্মিলিত কলকণ্ঠ বইএর পাতায় স্পষ্ট শুনতে পেলাম। তার চেয়েও বড় কথা এই যে কেবল তাদের বিশৃঙ্খল সংলাপই শুনছিলাম না, তাদের প্রত্যেকের বাচনভঙ্গীও, কে কেমন করে বলছে তা-ও যেন, স্পষ্টই দেখতে পেলাম। তাদের চোখের ভাষা, তাদের হাসি, তাদের অঙ্গভঙ্গী সব কিছুই স্পষ্ট দেখছি, অথচ বালজাক কোথাও তাদের মুখমণ্ডলের কোনো ছবি আঁকেননি, সমাগত অতিথিদের আকৃতিরও কোনো বিবরণ দেননি।

শব্দ দিয়ে এমন চরিত্র অঙ্কন করা, গল্পের মানুষগুলিকে এমন জীবন্ত ও তাদের কথাবার্তা যেন আমার কানের কাছেই হচ্ছে এমনভাবে শ্রুতিগোচর করে তোলা এবং সংলাপ সৃষ্টির এমন অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পেলাম বালজাকের লেখায় যার জন্যে বালজাক তথা ফরাসী সাহিত্যের উপর আমার শ্রদ্ধা বাড়ল অপরিসীম। বালজাক যেন তেল-রঙ দিয়ে ছবি এঁকেছেন। তাই জীবনে প্রথম রুবের চিত্রগুলি যখন দেখলাম, তখুনি আমার বালজাকের কথা মনে পড়ে গেল। ডস্টয়য়েভস্কির প্রাণবন্ত উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে আমার বার বার মনে হয়েছে, ঐ ফরাসী উপন্যাস-সম্রাটের নিকট তিনি অশেষ ঋণে আবদ্ধ। গঁকুর ভ্রাতাদের লেখা আমার বেশ ভালো লাগত—তাঁদের লেখা কলমের আঁচড়ে

আঁকা ছবির মতো শুষ্ক ও যথাযথ। আর ভালো লাগত জোলার লেখা—তাঁর ভয়াল কঠোর জীবনের চিত্র ভিক্টর হুগোর নভেলগুলি আমার তেমন ভালো লাগেনি। এমন কি তাঁর 'Quatervingt-treize' ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পড়েছি এই তাচ্ছিল্যের কারণ আনাতোল ফ্রাঁসের উপন্যাস 'Les Dieux Ont Soif' পড়বার আগে বুঝতে পারিনি। স্তাঁদাল-এর নভেলগুলি পড়ার আগেই জীবনে অনেক কিছুকে ঘৃণা করতে শিখেছিলাম—তাঁর শান্ত সুর ও বিদ্রূপাত্মক লেখা আমার সেই ঘৃণা আরো বাড়িয়ে দিল।

এতক্ষণ যা বললাম তা থেকে নিশ্চয় বোঝা যাবে, ফরাসীদের কাছ থেকে আমি লেখার শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আমার এই সৌভাগ্য যাকে বলে দৈবে ঘটেছে। তা ভালাই হয়েছিল। আপনাদেরও—তরুণ লেখকদের—আমি ফরাসী ভাষা শেখার জন্যে বিশেষভাবে বলছি, ফরাসী শিখে বড় বড় প্রতিভার সৃষ্টিগুলির সঙ্গে পরিচিত হন মূল ভাষা থেকে—তাঁদের কাছ থেকে শিখে নিন শব্দ দিয়ে অপূর্ব রস পরিবেষণের কলা-নৈপুণ্য।

এর বহু পরে রুশ সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদগুলি পড়লাম : গোগোল, টলস্টয়, টুর্গেনিভ, গঞ্চারভ, ডস্টয়েভস্কি ও লেস্কভকে ভালো করে চিনলাম। লেস্কভ তাঁর বিস্ময়কর জ্ঞান ও ভাষার ঐশ্বর্য দিয়ে আমায় প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই। সব জড়িয়ে বিচার করলে মানতেই হয়, তিনি একজন পাকা লেখক, রুশ-জীবন ও রুশ সমাজের সকল দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক ও গভীর আজ পর্যন্তও আমাদের সাহিত্যে তাঁর যোগ্য সমাদর দেখা যাচ্ছে না। শেকভও অবশেষে ঋণের কথা স্বীকার করে গেছেন। মনে হয় রেমিসভও তাঁর কাছে যথেষ্ট ঋণী ছিলেন।

এই সব সম্পর্ক ও প্রভাবের কথা এত করে বলছি এই কারণে যে, রুশ সাহিত্য ও বিদেশী সাহিত্যের ইতিহাস আমাদের লেখকদের জানা থাকা একান্ত আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

আমার বয়েস যখন বিশ বছর তখন থেকে মনে হতে লাগল—আমি জীবনে এত কিছু দেখেছি, শুনেছি ও এত বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি যে, সে সব বিষয় আমার অপর লোককেও বলা উচিত—বলতেই হবে। মনে হল, কতকগুলি বিষয় অপর লোকে যেমনভাবে বুঝেছে যেমনভাবে অনুভব করেছে আমার অনুভূতি ও আমার অভিজ্ঞতা তার থেকে আলাদা ধরণের। এই স্বাতন্ত্র্যের বোধ আমায় চঞ্চল করে তুলল, মুখর করে তুলল। এমন কি

টুর্গেনিভের মতো বিরাট প্রতিভার দান 'A Sportman's Sketches'-এর নায়কদের কাহিনী পড়তে পড়তে অনেক সময় মনে হত, আমি কিন্তু ঐ গল্প আলাদাভাবে বলতে পারতাম। ঐসময়ে ডক-মজুর, রুটিওয়ালা, ভবঘুরে, ছুতোর, রেলশ্রমিক, 'তীর্থযাত্রী' — এককথায় যাদের মধ্যে আমার জীবন কেটেছে সেই সব মহলে ভালো গল্প শোনাতে পারি বলে আমার বিশেষ খ্যাতি ছিল; তারা উৎকর্ণ হয়ে আমার গল্প শুনত। তাদের কাছে বইয়ে পড়া গল্পগুলি বলবার সময় প্রায়ই আমি খোদার উপর খোদকারি করে বক্তব্য বিষয় অল্পবিস্তর আলাদাভাবে বলতাম—আসল গল্পকে এভাবে নিজের মতো করে পরিবেশন করতে গিয়ে বইয়ের মূল কাহিনী কত না বিকৃত করেছি। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে নতুন কিছু ঢুকিয়ে দিতেও কসুর করিনি। আমার কাছে একাজ ছিল সহজ ও স্বাভাবিক; কেন না জীবন ও সাহিত্য আমার কাছে ছিল অভিন্ন। গ্রন্থ আমার কাছে মানুষের মতোই জীবনের এক প্রাণবন্ত প্রকাশ —গ্রন্থ এক জীবন্ত সত্তা, এক শব্দময় বাক্যময় অস্তিত্ব—মানুষের তৈরী আর সব জিনিসের মতোই তা নয়—এ 'বস্তু' একেবারে আলাদা জাতের।

আমার বুদ্ধিজীবী শ্রোতারা বলতেন: "তুমি লেখ না কেন? লিখতে শুরু কর।"

অনেক সময় মনে হত আমি নেশাচ্ছন্ন। আমার কাঁধে চেপেছে প্রগল্‌ভতার ভূত। জীবনে যত কিছু দেখে কষ্ট পেয়েছি, যা-কিছুতে খুশিতে মন ভরে গেছে সেই সব কথা বলবার আগ্রহে হয়ে দাঁড়ালাম যাকে বলে বাচাল। সে সব কথা শুনিয়ে তবেই বুঝি আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারি। মাঝে মাঝে এক-একটা বুক-ভরা দুরন্ত কথা উপরে ঠেলে উঠে কণ্ঠরোধ করত। তখন চীৎকার করে জানাতে চাইতাম: আমার বন্ধু আনাতোলী, শার্সিতে কাচ বসিয়ে খায় সে; কেউ তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসছে না; হয়তো এখনো সেই গুণী ছেলেটাকে বাঁচান যায়—থেরেসা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরে; সে যে গণিকা, তার জন্যে তার কী অপরাধ; যে সব ছাত্র তার কাছে যাতায়াত করে তারাতো তা বোঝে না—তারা বোঝে না বুড়ী ভিখারী মাতিসার কথাও; জানে না যে, আমাদের গ্রন্থকীট যুবতী ধাত্রী ইয়াকোভলেভার চেয়ে সে ঢের বেশি বুদ্ধিমতী।

আমার অতি-ঘনিষ্ঠ ছাত্র বন্ধু প্লেটনিয়ভকে পর্যন্ত কোনো কথা না জানিয়ে গোপনে গোপনে কবিতা লিখতে লাগলাম। কবিতার বিষয় হল থেরেসা ও আনাতোলিয়া। কবিতা লিখলাম বসন্ত কালের গলিত তুষার নিয়ে—যে তুষার

রুটিওয়ালার ভাঁড়ারে অবিশ্রান্ত ঢুকবে বলে রাস্তার নোংরা জলের মধ্যে গলে মিশে যায় নি। ছন্দোবদ্ধ ভাষায় লিখলাম, ভলগা বড় সুন্দর নদী, কুজিন হচ্ছে জুদাস্ ইস্ক্যারিয়ট এবং জীবন হচ্ছে জঘন্য আর বেদনাদায়ক, যার চাপে আত্মা যায় মরে।

কলমের মুখে কবিতা এল অনায়াসেই; কিন্তু বুঝতে পারলাম, আমার কবিতা একেবারে বাজে মাল। নিজের কবিত্ব-শক্তির অভাবের জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। পুশকিন, লার্মনটভ, নেক্রাসভ এবং কুরুচকিনের অনূদিত বেরাঞ্জার পড়ে ভালো করেই উপলব্ধি হল যে, আমি তাঁদের জাতের লোক নই। গদ্য লিখব সে ভরসাও পাচ্ছি না। কারণ গদ্য লেখা পদ্য লেখার চেয়েও কঠিন কাজ বলে আমার ধারণা ছিল; গদ্যে বিশেষ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির আবশ্যক হয়—অপরের চোখে যা পড়ে না এমন কিছু দেখার ক্ষমতা ও বাছা বাছা শব্দ সাজাবার অত্যধিক চাতুর্য থাকা চাই। যাহোক অবশেষে গদ্য লিখতে প্রবৃত্ত হলাম। প্রথমে কাব্যধর্মী গদ্য দিয়ে শুরু করলাম এই ধারণা থেকে যে, সাধারণ গদ্য লেখা আমার ক্ষমতার বাইরে। আমার ঐ প্রয়াসের ফল দাঁড়াল এক কথায় হাস্যকর। ছন্দের দোলা-লাগানো গদ্যে লিখে ফেললাম এক মস্তবড় কবিতা যার নাম দিয়েছিলাম 'Song of the Old Oak,' ভি. জি. করোলেন্‌কো তাঁর কলমের দশটি শব্দে এই 'বনস্পতির' মূলসুদ্ধ উপড়ে দিলেন। স্পষ্ট মনে আছে, ঐ সুদীর্ঘ কবিতায় আমি 'The Whirlpool of Life' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের (যতদূর মনে পড়ছে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'নলেজ'-এ) জবাবে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে আমার অভিমত জানাতে চেয়েছিলাম। সেই সমগ্র লেখার শুধু একটি মাত্র লাইন এখনো মনে আছে। তা হচ্ছে:

"একমত হব না বলেই আমি এ-জগতে জন্মগ্রহণ করেছি।" মনে হচ্ছে, আমি বিবর্তনবাদের সঙ্গে একমত হতে পারিনি।

একথা বোধ হয় নাডসনই বলেছিলেন যে, 'আমাদের দীন মাতৃভাষায় আলো আর উত্তাপের অভাব আছে' এবং আমাদের বহু কবি আমাদের ভাষায় এই দারিদ্র্য নিয়ে নালিশ জানিয়েছেন।

আমার মনে হয়, এরূপ অভিযোগ কেবল রুশ ভাষা সম্পর্কেই নয়; সব ভাষার সম্পর্কেই ঐ নালিশ চলে। এরূপ অভিযোগের মূল কারণ এই যে, মানুষের এমন সব পলাতক চিন্তা ও অনুভূতি আছে যা ভাষায় রূপ দেওয়া

যায় না। এই সব অনির্বচনীয় ভাবের কথা ছেড়ে দিলে রুশ ভাষার ঐশ্বর্য অফুরন্ত; সেই অক্ষয় সম্পদ বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে।

এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভালো, ভাষা গড়ে তোলে জনসাধারণ। লেখ্য ও কথ্য এই দুইভাগে ভাষাকে ভাগ করার অর্থই এই যে, একদিকে আমাদের আছে এমন এক ভাষা যাকে বলা চলে কাঁচা মাল এবং আর একদিকে আছে বহু পাকা হাতের তৈরী মাল। এ-কথা সর্বপ্রথম পুশকিন ভালো করে বুঝেছিলেন। তিনিই প্রথম দেখিয়ে দিলেন, কী করে জনসাধারণের কাঁচা-মাল ভাষাকে ব্যবহার করা যায়, কী করে তাকে ঢেলে সেজে রূপ দেওয়া যায়।

লেখক হচ্ছেন তাঁর দেশের ও তাঁর শ্রেণীর মুখপাত্র। তিনি তাঁর স্বদেশ ও স্বসমাজের যেন চক্ষু, কর্ণ আর হৃদয়। এক কথায় তাঁর যুগের তিনি বাণী বা প্রতিধ্বনি। তিনি যথাসাধ্য সব কিছু জানবেন। অতীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকবে যত বেশি ততই তিনি নিজের যুগকে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন, ততই তিনি তাঁর কালের সার্বজনীন বিপ্লবী রূপ ও তাঁর কর্তব্যের পরিধি তীব্রভাবে, গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। জনগণের ইতিহাস তাঁর জানা উচিত, শুধু উচিত বললেই হবে না, তাঁকে তা জানতেই হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে জনগণের মনোভাব কী তাও তাঁকে বুঝতে হবে। নৃতত্ত্ববিদ্ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের পণ্ডিতরা আমাদের জানিয়েছেন, জনগণের চিন্তাধারাই প্রকাশ পায় গল্প, কাহিনী, উপাখ্যান, প্রবচন, প্রবাদবাক্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। বস্তুত প্রবাদবাক্য ও প্রবচন জনসাধারণের চিন্তন-ভাবনের নিখুঁত ও সুন্দর প্রকাশ।

প্রবচন ও প্রবাদবাক্যের মধ্যে অতি সংক্ষেপে চমৎকার রূপ পায় শ্রমোপজীবী জনগণের সমগ্র সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। লেখককে অবশ্য এই কাঁচা মাল নিয়ে গবেষণা করতে হবে। তার ফলে তিনি কতকগুলো শব্দকে করবেন সংক্ষিপ্ত, ঘনীভূত—যেমন হাত মুষ্টিবদ্ধ করতে হলে আঙুল সঙ্কুচিত সীমাবদ্ধ করতে হয়; আবার অপর লোকের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ঘনীভূত শব্দকে আবশ্যক মতো তিনি প্রসারিত উদ্ঘাটিত করে তার অন্তর্নিহিত যুগধর্মবিরোধী অসারতা দেখিয়ে দেবেন।

প্রবাদবাক্য বা প্রবাচনিক চিন্তাধারা থেকে আমি অনেক শিক্ষা লাভ করেছি।

এই জাতীয় জীবন্ত বলিষ্ঠ চিন্তা আমারও চিন্তার খোরাক ও লেখার প্রেরণা যুগিয়েছে। কুলী-মজুর, কেরানী ও অপদার্থ অপাঙ্‌ক্তেয় সমাজের এই জাতীয় চিন্তন-কথনকে বহু গ্রন্থে আলাদা ভাষার সাজ পরে এসে হাজির হতে দেখেছি। বস্তুত বাস্তব জীবন আর সাহিত্য পরস্পরের পরিপূরকের কাজ করে।

আগেই সাহিত্যরথীদের জীবন্ত চরিত্র অঙ্কনের লিপি-চাতুর্যের কথা বলে এসেছি। এ-প্রসঙ্গে দুটি দৃষ্টান্ত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে করছি :

গ্যেটের 'ফাউস্ট' পৃথিবীর শিল্প-সৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। 'ফাউস্ট' কল্পনার ফল, মস্তিষ্কের দান, চিত্রে চিন্তার রূপ-পরিগ্রহণ। আমি যখন ফাউস্ট পড়ি আমার বয়েস তখন বিশ বছর। এর কিছুকাল পরে জানতে পারলাম, জর্মান লেখক গ্যেটের দু'শ বছর আগে ইংরেজ লেখক ক্রিস্টোফার মার্‌লো ও ফাউস্ট সম্পর্কে লিখে রেখে গেছেন; 'Pan Tvardovski' নামের একখানি পোলিশ উপন্যাসও 'ফাউস্ট' এর মতো; ফরাসী লেখক পল ম্যুসে-এর 'Seeker After Happiness'ও তাই। আরো জানতে পারলাম, ফাউস্ট নিয়ে লেখা সকল গ্রন্থের একটিই মূল উৎস—মধ্য যুগের একটি উপাখ্যান। এই লোক-কাহিনীটিতে একটি লোক ব্যক্তিগত সুখভোগ এবং মানুষ ও প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য তার আত্মা বিক্রয় করেছিলে। মধ্য যুগে নিকৃষ্ট ধাতু থেকে স্বর্ণ তৈরী ও অমরত্বের সুধা প্রস্তুতের জন্য গুপ্ত-বিদ্যার সাধকদের নিষ্ফল প্রয়াস এই কাহিনীর উৎস। এই সব রহস্য-বিদ্যার সেবকদের মধ্যে যেমন বহু স্বপ্নদর্শী সৎপ্রকৃতির লোক বা ভাবোন্মাদ ছিলেন, তেমনি ঠক-প্রতারকেরও অভাব ছিল না। তাঁদের উচ্চতর শক্তি লাভের প্রচেষ্টার ব্যর্থতাকেই ডক্টর ফাউস্টের অভিযান কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদ্রূপ করা হয়েছে—দৈব-শক্তির সহায়তা লাভ করেও ফাউস্ট অমর ও সর্বজ্ঞ হতে পারেননি।

ফাউস্টের অসুখী জীবনের চিত্রের মতো আর একটি চরিত্রেও সকল দেশেই সুপরিচিত। ইতালীতে সে পুলসিনলো, ইংলণ্ডে পাঞ্চ, তুরস্কে কারাপেত, আমাদের দেশে পেট্রস্‌কা। পুতুল-নাচের অজেয় অমর বীর সে; পুলিস, ধর্মযাজক, এমনকি মৃত্যু ও অসুরকে পর্যন্ত সে হার মানায়, সকলকেই পরাস্ত করে। এই সহজ সুন্দর স্থূল চিত্রণে শ্রমোপজীবী মানুষ তার নিজের মনকেই রূপায়িত করেছে, নিজের এই দৃঢ় বিশ্বাসেরই রূপ দিয়েছে যে, ভবিষ্যতে একদিন সবকিছুকে তারাই করবে পরাভূত, সবাইকে তারাই করবে পর্যুদস্ত।

পূর্বে যা বলেছি তাকে সমর্থন করছে এই দুটি দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ কোনো

সামাজিক স্তরের শ্রেণীগত সবিশেষ লক্ষণগুলি সেই সমাজেরই কোনো এক ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে একাধারে রূপায়িত করার যে সাহিত্য-ধর্ম বা নিয়মের কথা বলেছি, এই সব 'অনামী' সাহিত্য-সৃষ্টি বা অজ্ঞাতলোকের রচনাবলী—সম্পর্কেও সেই নিয়ম প্রযোজ্য। এই নিয়ম যথাযথ মানতে পারলে লেখকের পক্ষে টাইপ বা প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র সৃষ্টি করা সহজ হয়। এই ধর্ম মেনেই শলি দ্য কস্তে ফ্লেমিংদের জাতীয় টাইপ বা মুখপাত্র 'Till Ulenspiegel' সৃষ্টি করেছেন ; রম্যাঁ রলাঁ সৃষ্টি করেছেন তাঁর বার্গাণ্ডিয়ান 'কোলা ব্রেঞঁ' ; আলফঁস দোদে তাঁর 'প্রভেন্সাল তার্ত্যাঁতারা অব তারাসস্কঁ'। কোনো লেখক তাঁর পর্যবেক্ষণ-শক্তিকে এবং মিলগুলি খুঁজে বার করা ও অমিলগুলি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাকে যতক্ষণ না পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত করতে পারছেন—যতক্ষণ না তিনি সব সময় আরো আরো আরো জানার জন্যে উন্মুখ হতে পারছেন, ততদিন মুখপাত্র বা টাইপের অপূর্ব চিত্র অঙ্কনে তিনি সক্ষম হবেন না। যেখানে যথাযথ জ্ঞানের অভাব সেখানেই তার স্থান নেয় আন্দাজ ; আর এই জাতীয় দশটি আন্দাজ-অনুমানের ন'টিই হয় ভুল।

অবলোমভ, রুবিন, রিয়াজানোভ প্রভৃতির মতো চরিত্র ও টাইপ সৃষ্টি করার অদ্ভুত ক্ষমতা আমার আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু আমাকেও 'Foma Gordeyev' লিখবার আগে ব্যবসায়ী পিতার জীবনও পেশায় বীতশ্রদ্ধ বিরক্ত হয়ে উঠেছে এমন বহুসংখ্যক পুত্রকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে। তাদের সকলেরই মনে মোটামুটি এই ধারণা ছিল যে, তাদের ঐ একঘেয়ে, নিঃস্ব, ক্লান্তিকর জীবনে আকর্ষণযোগ্য কিছু নেই। আমার 'ফোমা' যাদের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি, তারা এক নীরস নিষ্করুণ জীবনে আটকে পড়েছে, সেই জীবন সম্পর্কে তাদের চিন্তা ভাবনা ও অসন্তোষের অন্ত নেই—তাদের কেউ কেউ অত্যধিক মদ্যপানের দিকে ঝুঁকে পড়ে জাহান্নমে গেছে, জীবনটাকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে ; কেউ বা সাভা মোরোজভের* মতো 'শ্বেত দাঁড়কাক' হয়েছেন। বিস্তর লোকের বিস্তর ছোটখাট লক্ষণ ও বিশেষত্ব থেকে, বহু 'প্রবচন' থেকে টেনে বার করে এনে তবে আমায় ফোমা গর্ডেয়েভের ধর্মপিতা মেয়েকিনকে যেন বুনে তুলতে হয়েছে। ঐ চিত্র এঁকে আমি ভুল করিনি। ১৯০৫ সালে কৃষক ও শ্রমিকরা যখন তাদের দেহপাত করে মেয়েকিনের ক্ষমতা লাভের পথ পরিষ্কার

---

* মোরোজভ ছিলেন একজন রুশ পুঁজিপতি, তিনি নানাভাবে অর্থ দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে সাহায্য করেছিলেন।

করে দিয়েছিল, তখন আমাদের পরিচিত মেয়েকিনের দল মজুর-শ্রেণীর বিরুদ্ধে সেই সংগ্রামে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেনি। আজও তারা তাদের সেই পুরাতন পাকাপোক্ত আশ্রয় আবার ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখছে।

যুবক বন্ধুরা আমায় প্রশ্ন করে থাকেন, কেন আমি ছন্নছাড়া আর লক্ষ্মীছাড়াদের নিয়ে গল্প লিখেছি।

আমি নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বাস করেছি। আমার চারপাশে দেখেছি এমন সব লোক যাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ছলে বলে কৌশলে অপরের ঘাড় ভেঙ্গে নিজের সুবিধে করে নেওয়া, যাদের কাজই হচ্ছে অপরের প্রাণান্ত পরিশ্রমের কোপেক নিজের করে নিয়ে সেই কোপেক আবার রুব্‌ল-এ পরিণত করা। আমার পনের বছরের পত্রলেখিকার মত আমিও ঐ অতি সাধারণ মানুষগুলির পরাবলম্বী জীবনকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলাম। একই টাঁকশাল থেকে বার হয়ে আসা তামার মুদ্রাগুলির মতো তাদের সকলকেই মনে হত একই রকম।

এক্ষেত্রে আমার চোখে ছন্নছাড়ারা ছিল 'অসাধারণ' লোক, তারা সত্যই অসাধারণ, কেননা তারা ছিল 'শ্রেণীচ্যুত'। তারা নিজেদের সমাজের বন্ধন ছিঁড়ে চলে এসেছে বা সমাজই তাদের অপাঙ্‌ক্তেয় বলে দূরে ঠেলে দিয়েছে। ফলে তাদের মধ্যে স্ব-শ্রেণীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বৈষম্যের কোন লক্ষণ চোখে পড়ত না। নিঝনি নভগোরোদে, 'মিলিয়ঙ্কা'-তে, 'গোল্ডেন কোম্পানী'র মধ্যে বেশ দিন কাটাচ্ছিলেন এককালের ধনী ব্যবসায়ীরা আজ যারা নিঃস্ব, নিশ্চিন্তে ছিলেন আমার স্বপ্নবিলাসী সম্পর্কিত ভাই আলেকজান্দার কাশিরিন, ইতালীয় শিল্পী টনটিনি, প্রাক্তন ব্যায়াম শিক্ষক-গ্লাডকোভ, জনৈক ব্যারান, ডাকাতির ব্যাপারে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ এক সহকারী পুলিস ইন্সপেক্টর এবং বিখ্যাত চোর 'জেনারেল নিকোল্‌কা' যার আসল নাম হচ্ছে ভ্যান-ডার-ভি্লেটফ্লিট।

কাজানে 'গ্লাস ফ্যাক্টরীতে' জন বিশেক লোকের এমনি আর একটি দলের সংস্পর্শে এলাম। এরাও কম বিচিত্র ধরনের নয়। এদের মধ্যে ছিল: রান্দলভ বলে একজন ছাত্র—নাম তার রাভুনভও হতে পারে; দশ বছরের জেলখাটা এক বুড়ো পাথর-সংগ্রাহক; গবর্নর আন্দ্রেয়েভস্কির এক ভূতপূর্ব আরদালী ভাস্‌কা গ্রাচিক; এক বাইলো-রাশিয়ান ধর্মযাজকের ইঞ্জিনড্রাইভার পুত্র রদজিয়েভিচ, ঘোড়ার ডাক্তার দাভিদভ; এদের অধিকাংশই ছিল ব্যাধিগ্রস্ত ও মাতাল। প্রায়ই এরা ঝগড়া করত, মারামারি করত। কিন্তু পরস্পরকে সাহায্য করার বন্ধুতার

ভাব এদের মধ্যে চমৎকার গড়ে উঠেছিল। যা কিছু তারা নিয়ে আসত, চুরি করেই হক বা যে ভাবেই হক, তাই তারা সকলে মিলে ভাগ করে খেত—তা মদই হক কি খাবারই হক। সাধারণ লোকেদের চেয়েও তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা খারাপ ছিল; তারা নিজেরা কিন্তু মনে করত তুলনায় তারা ভালোই আছে; মনে করতে পারত এই জন্যেই যে, তারা লোভী নয়; পরশ্রীকাতর নয়; অপরকে দাবিয়ে ঠকিয়ে নিজের সুবিধে করে নেওয়ার কোনো চেষ্টা তাদের নেই; তাদের কেউ টাকাকড়িও জমায় না....

এই ছন্নছাড়াদের মধ্যে অদ্ভুত প্রকৃতির লোকও দেখেছি। তাদের সম্পর্কে অনেক কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। তবু তাদের প্রতি আমার একটা পক্ষপাত ছিল। তার কারণ তারা জীবনে দুঃখকষ্ট নিয়ে কাঁদতে বসে না, অভিজাত শ্রেণীর আরামের জীবন নিয়ে কটাক্ষও করে না, কটূক্তিও করে না—তাদের এই তাচ্ছিল্যের মূলে মনের তলে পুষে রাখা কোনো গোপন হিংসা ছিল না, ছিল না আঙুর ফল বড় টক তাই খারাপ বলার মনোবৃত্তি। আসল কারণ, তাদের অভিমান, মনে মনে তাদের অহঙ্কার। তারা জানত, 'অত্যন্ত খারাপ ভাবে' থাকলেও 'অত্যন্ত ভালোভাবে' যারা আছে তাদের চেয়ে তারা নিঃসন্দেহে উন্নততর মানুষ।

'The Hasbeens' এ তে যে সরাইওয়ালা কুভালদার বিবরণ দিয়েছি, তাকে প্রথম দেখেছিলাম বিচারপতি কোলটেয়েভের এজলাসে। বিচারপতির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এই শতছিন্ন বস্ত্র-পরিহিত লোকটা যে মর্যাদাবোধের পরিচয় দিল তা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। পুলিস, সরকারী উকিল ও হোটেলওয়ালার জেরার জবাব দিল সে অপরিসীম অবজ্ঞায়। এমন অবাক হয়ে ছিলাম ওডেসাতে আর একটি সৃষ্টিছাড়া মানুষের মিঠে-কড়া বিদ্রূপ শুনে। তার কাছ থেকে শোনা গল্প নিয়েই লেখা আমার 'চেলকাশ'। এর সঙ্গে আমার দেখা হল হাসপাতালে। দু'জনেই শয্যাশায়ী রোগী। তার হাসি, তার চমৎকার সাদা ধবধবে দাঁতের পাটি আজও স্পষ্ট মনে আছে। সেই হাসি দিয়ে সে তার গল্প শেষ করল। তার একটা কাজ করিয়ে নেবার জন্যে অল্প বয়সের একটি ছোকরাকে সে ভাড়া করে এনেছিল। শেষকালে সেই ছোকরাই কিনা তার উপর টেক্কা দিতে চাইল। এই হচ্ছে তার কাহিনী। 'ছেলেটাকে ছেড়ে দিলাম—টাকা কড়িও কেড়ে রাখলাম না। বললাম, এবার যাও বেকুব, আণ্ডেপিণ্ডে গেল গে যাও।'

তাকে দেখে মনে পড়ে ডুমার 'মহৎ' নায়েকদের কথা। আমরা দু'জনে এক

সঙ্গেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম। শহরের বাইরে একটা ক্যাম্পে দু'জনে বসে গল্প করছি। সাদরে আমায় তরমুজ খেতে দিয়ে প্রস্তাব করল: "আমার সঙ্গে যেতে রাজি আছ? তোমায় দিয়ে আমার একটা আচ্ছা কাজ হাসিল করাতে চাই। তুমি বেশ পারবে বলে আমার মনে হচ্ছে।"

শুনে আমি বেশ গর্ব অনুভব করলাম। কিন্তু জীবনে ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছিলাম, চুরি জোচ্চোরি আর বেআইনী ব্যবসায়ে হাত পাকাবার চেয়ে ভালো কাজ করার মতো আমার অনেক কিছু আছে।

আমি যা বলতে চাইছি তা এই যে, ছন্নছাড়া মানুষের উপর আমার পক্ষপাতের মূলে আছে 'অসাধারণ' লোকেদের ছবি আঁকার বাসনা—সংকীর্ণমনা পাতি-বুর্জোয়াদের নয়। অবশ্য আমার এই প্রেরণার মূলে আছে বিদেশী সাহিত্যের, বিশেষভাবে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব। ফরাসী সাহিত্য আমাদের রুশ সাহিত্যের চেয়ে ঢের বেশি উজ্জ্বল, অনেক বেশি বিচিত্র। সবার উপরে 'ক্লান্তিকর কাঙালের জীবনকে' আমার কল্পনায় অলঙ্কৃত করার অদম্য ইচ্ছাই আমার লেখার প্রেরণা। সেই কঠোর কঠিন জীবন সম্পর্কেই আমার পনের বছরের পত্রলেখিকা মেয়েটি তার মনোভাব জানিয়েছে।

এই যে লিখবার অভিলাষ তারই নাম 'রোমান্টিসিজম্'।

আমার কাছে নেই মানুষের অতীত কোনো ভাব বা মানুষের অতীত কোনো চিন্তা। আমার কাছে মানুষই সকল বিষয়, সকল চিন্তা-ভাবনার জন্মদাতা। মানুষই অভাবিত অঘটনের স্রষ্টা। প্রকৃতির সমস্ত শক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ামক এই মানুষ। আমাদের এই পৃথিবীর যত কিছু সুন্দর শোভন জিনিস, তা সবই সৃষ্টি করেছে মানুষের শ্রম, মানুষের নিপুণ হস্ত—আমাদের সমস্ত রকম চিন্তাধারা, সর্ববিধ ভাবানুভব মানুষের শ্রমেরই ক্রমবিকাশের ফল। শিল্প, সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আদ্যন্ত ইতিহাস আমাদের এই কথাই বলে। যা হয় যা ঘটে তাই আগে—তারপরে আসে ধ্যান-ধারণা। এই মানুষের কাছে আমি মাথা নোয়াই, কারণ এ জগতে মানুষের বুদ্ধি ও মানুষের কল্পনার-রূপ পরিগ্রহের অতীত কোনো কিছু আমি দেখি না, উপলব্ধিও করি না।

পবিত্র বিষয় নিয়ে যদি কথা বলতে হয়, তা হলে আমার কাছে সব চেয়ে পবিত্র বিষয় হচ্ছে মানুষের নিজেরই উপরে তার অসন্তোষ, তার আরও ভালো হবার আরও বড় হবার সাধনা; পবিত্র বিষয় হচ্ছে নিজের হাতে গড়া সমস্ত তুচ্ছ জঞ্জাল সম্পর্কে তার ঘৃণা; পবিত্র বিষয় হচ্ছে তার লোভ, হিংসা, ব্যাধি ও যুদ্ধের অবসান ঘটানোর ইচ্ছা; পবিত্র তার শ্রম।

অনুবাদ: **স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য**

প্রয়োগ ও শিল্পকর্মে জীবনের ভূমিকা

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ম্যাক্সিম গোর্কি

বস্তুর বিবর্তন প্রক্রিয়াই সমস্ত শক্তির উৎস—আর এদিক থেকে দেখলে জীবন আশ্চর্য রকমের সরল ; অন্যদিকে জীবন সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধেরও বিকাশজাত—আর সে দিক থেকে দেখলে তা সব রকমের নীচতাও মিথ্যাচারে ঠাসা। সারল্য—সত্যের দাবী ; জটিলতা—মিথ্যার দোসর। সাহিত্যের ইতিহাসই এর জ্বলজ্যান্ত সাক্ষী।

প্রাচীনকালে, যখন শ্রমের পদ্ধতি ছিল আদিম—প্রভু ও ভৃত্য, এই দুই শ্রেণীতে মানুষ যেদিন ততটা কঠোরভাবে বিভক্ত হয়ে যায়নি—শ্রমজীবী মানুষ সেদিন মুখে মুখেই সৃষ্টি করেছে অসামান্য সব চিত্রকল্পের, তার উপকথায়, কিংবদন্তীতে। সেই মৌখিক সাহিত্যের সাধারণ বিষয়বস্তু ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে অথবা প্রকৃতির রহস্য-জানা কুহকীদের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের কাহিনী ; আর ছিল স্বপ্ন—একদিন-না-একদিন শ্রমজীবী মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ামক হবেই হবে। এ ছিল একটি সার্বজনীন বিষয়বস্তু। ধ্রুপদী কাব্য ও গদ্য সাহিত্যের সার্বজনীনতা গড়পড়তা বুর্জোয়া মানের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত। সার্বজনীন হিসেবে পরিচিত অতীতের ঐসব সাহিত্য কীর্তিগুলির মধ্য দিয়ে, রীতিমত নিরাশার সুরে হলেও জীবনের মর্মান্তিক জটিলতা এবং সমগ্র ইতিহাসের বিকাশধারার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি মানুষ নিজের তুচ্ছতা প্রসঙ্গেও কি ভাবে সচেতন হয়ে ওঠে এসবেরও একটা হদিশ পাওয়া যায়। প্রভু শ্রেণীর লোকেরা নানাভাবেই এই সব অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করেছে ও প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি দাস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যারা, তারাও এসব অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল না।

ঐ অভিজ্ঞতা উভয় শ্রেণীকেই ভাববাদী দর্শনের কল্পলোকে এবং ধর্মীয় কুয়াশার আচ্ছন্নতায় নিক্ষেপ করে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ভাস্কর গ্লাইকন হারকিউলিসের শেষ বীরত্বের মূর্তি খোদাই করেন। তিনি দেখান, এই অসামান্য বীর কর্মীটি নিজের হাতে অমৃত ফল ধরে রয়েছে। অথচ কি ভঙ্গিমার দিক থেকে, কি মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তির দিক থেকে সেই মূর্তির কোথাও কোনো বিজয়ানন্দের আভাস মাত্র নেই—বরং তা যেন ক্লান্তি ও নৈরাশ্যে ভারাক্রান্ত। অন্যদিকে, এও বেশ কৌতূহলের সঙ্গেই লক্ষ্য করা যায়, যে বুর্জোয়ারা একদা সামন্ত প্রভুদের উচ্ছেদ করেছিল, বিজয়ী হিসেবে নিজেদের বিজয়কে কেন্দ্র করে তারা কিন্তু কোনো শিল্পই রচনা করেনি।

নিরবচ্ছিন্ন এই সংগ্রাম; জয়ও সুসংহত। অথচ এ বিজয়কে ঘিরে কোনো সমারোহ নেই। থাকলেও রয়েছে তা খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং চোখ ধাঁধানো আড়ম্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে। যেমনটি দেখা গেছে জার্মান বুর্জোয়াদের সবচেয়ে ক্ষমতাশীল অংশের মুখপাত্র অপরিসীম ঘৃণ্য হিটলারের হীন ও রক্তাক্ত সাম্প্রতিক বিজয়াভিযানগুলির মধ্য দিয়ে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপে ব্যক্তির যথার্থ শিল্পরূপ বলতে এমন একটি চরিত্রকেই বোঝাত, যে কিনা বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার সমালোচক অথবা জীবনের ভোগ-ভোগাস্তিগুলোর বিরুদ্ধেও যার বহু অভিযোগ। অথবা, এমন এক ব্যক্তিমানুষ যে প্রকৃতির প্রথম সত্তা বস্তু ও দ্বিতীয় সত্তা সামাজিক সম্পর্কের তোয়াক্কা না করে স্বতন্ত্র জীবনযাপনে ইচ্ছুক; যে স্বয়ম্ভূ জীবনচর্যায় অভিলাষী। যে প্রত্যয় সে লাভ করেছে নতুন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কোয়েনিস বার্গের বুড়ো দার্শনিকের* যান্ত্রিক চিন্তাসূত্র থেকে।

কিন্তু পৃথিবীতে আজ এমন একটা দেশের অভ্যুদয় ঘটেছে বুর্জোয়ারা যেখানে পরাজিত। কেবলমাত্র বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণীর দিক থেকেই নয়, বুর্জোয়াদের যারা মূল শক্তি, জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প সংস্কৃতির যারা হোতা, সেইসব বিজ্ঞানী ও সংস্কৃতি সাধকদের দিক থেকেও এই ঘটনার তাৎপর্য 'সার্বজনীন'; বুর্জোয়াদের চাহিদার তুলনায় ইতিমধ্যেই সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেছে তারা, এবং সমাজে নিজেদের নাটকীয় অবস্থান ও ইতিহাসের কার্য-পরম্পরা অনুধাবন করে এও তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, নিজেদের শৈল্পিক স্বাধীনতা সুরক্ষিত করতে হলে একটি মাত্র রাস্তাই তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত—তা হল বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর রাস্তা।

---

* ইম্যানুয়েল কান্ট, ১৭২৪—১৮০৪। স.

সোভিয়েত লেখকদের উপর ইতিহাস আজ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি সাহিত্য সৃষ্টির দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে—সে সাহিত্য হবে মৌল তাৎপর্যে সার্বজনীন। সারা বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণীর ঘুম ভাঙাবে এ সাহিত্য, বৈপ্লবিক অধিকারবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে তাদের। আমাদের চারপাশে আজ এত অজস্র উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে, যেগুলিকে অবলম্বন করে অতি উচ্চ পর্যায়ের শিল্পগুণান্বিত কাব্য ও গদ্য সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এগুলো অবশ্যই নতুন ধরনের উপাদান। শ্রমিক কৃষকের বিপ্লবী, সৃজনশীল বীরত্ব ও তাদের বহুমুখী প্রতিভাই হল এই সব উপাদানের উৎস। একটি অশ্রুতপূর্ব বিজয়—সর্বহারা শ্রেণীর বিজয় ও একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা এই নতুন উপাদানের উৎস। এই যে বিজয়, এর ঐ মৌল ঐতিহাসিক তাৎপর্যই আজ আমাদের সাহিত্যের এলাকা থেকে ব্যক্তিগত জীবন যাপনের অসহায়তা, নৈরাশ্যবোধ ও বিষাক্ত ভ্রান্তিতে ভরা খ্রীষ্টতন্ত্রের মদতপুষ্ট আত্মনিগ্রহের ধ্যানধারণা-নির্ভর বিষয়বস্তুগুলিকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে। এতাবৎকাল মানুষের দুঃখ কষ্টকে এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা কিনা ব্যর্থ ও নিষ্ফল একটা করুণা উদ্রেক করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। খুব কদাচিৎ তা এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে যাতে সংস্কৃতির সেইসব নামগোত্রহীন নির্মাতাগণ নিজেদের হারিয়ে-যাওয়া মানবিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েছে। অথবা নিজেদের দুঃখ-যন্ত্রণা এবং এর উৎস জীবনের ঘৃণ্য বিভীষিকা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণায় উদ্বেলিত হয়েছে।

প্রভু শ্রেণীগুলির ভোগ বিলাসের ইন্ধন জুগিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেরা নিগ্রহের বোঝা বয়ে যাওয়ার নির্লজ্জ বাধ্যবাধকতাকে বিশ্বের সতেরো কোটি মানুষ আজ নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। এখনও হয়ত জীবন থেকে অস্বাচ্ছন্দ্যের বাহ্য কারণগুলিকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারেনি তারা—এর জন্য দায়ী যেমন সময়ের অভাব, তেমনই কিছুটা নিজেদের নিষ্ক্রিয়তা ও সুশিক্ষার অভাবপ্রসূত নানা মনগড়া আশা-আকাঙ্ক্ষা, যার দরুন আজও তাদেরও অনেকেই 'সস্তা উপভোগের জীবন যাপনের জন্য' লালায়িত হয়ে ওঠে। এই জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ঘিরে ঐ যে অতি আগ্রহ তার হেতু এই যে, বাইরের দিক থেকে পাতি-বুর্জোয়াদের হঠিয়ে দেওয়া গেলেও স্বশ্রেণীসুলভ অবক্ষয়ের ঝিম ধরানো দুর্গন্ধটুকু নিয়েই আজও তারা আমাদের মনোজগতে 'টিঁকে আছে'।

নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্যমে ভরা এবং একাধারে বিকাশ ও বিনাশের

প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকা যে মানুষ, সেই হল সাহিত্যের মৌল উপাদান। উপাদানের অভাব নেই আমাদের, আসল কথা আমরা তাকে অনুধাবন করছি ভ্রান্তভাবে; আমাদের ঘাটতি হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের শিল্পগুণমণ্ডিত করে তাকে রূপায়িত করার দক্ষতায়। দক্ষতা আসে জ্ঞান থেকে; বলাই বাহুল্য, ঐ জ্ঞানেই আজ নিজেদের সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে আমাদের, প্রকৃত দক্ষতা ও সততার সঙ্গে শিখতে হবে সৃজনকর্ম। আমাদের অনেক কিছুই শিখতে হবে, আর আমাদের এই পরিবেশে ঐ শেখাটা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপারও কিছু নয়, যেহেতু শাসনের ভার হাতে তুলে নেওয়া সর্বহারা শ্রেণী, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পথে পা বাড়াতে ইচ্ছুক যুব সমাজের সমুখ থেকে সারি সারি সমস্ত পাঁচিলগুলোকে ভেঙে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

সোভিয়েতের লেখকেরা আজ রয়েছেন ঘটনাপ্রবাহের কেন্দ্রস্থলে, সারা বিশ্বের দিক দিয়ে তাৎপর্যমণ্ডিত একটি প্রক্রিয়ার মর্মমূলে। এ হল, জমি ও শ্রমের হাতিয়ারগুলির ওপর থেকে ব্যক্তি-মালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়ে ও সমাজের বুকে জেঁকে বসা যত ধরনের পরগাছাবৃত্তি থাকতে পারে সেই সমস্ত কিছুর ধ্বংস সাধন করে সংস্কৃতির উৎসমুখকে অবারিত করে দেওয়ার প্রক্রিয়া। অথচ বাস্তবিকভাবে এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েও সোভিয়েত লেখকেরা এই প্রক্রিয়ার রূপায়ণে এসে, এ প্রক্রিয়ারই সবচেয়ে প্রাণবন্ত যে শক্তি—সেই মানুষকে আঁকছেন ভাসা ভাসা ভাবে, অযত্নের সঙ্গে এমনকি কখনও কখনও বা হেলা ফেলা করে। মানুষের কথা বলছেন তাঁরা, কিন্তু কথাগুলো মনে হচ্ছে অন্তঃসারশূণ্য, ফাঁকা, নিছকই নিষ্প্রাণ কিছু স্তাবকতা মাত্র, যার থেকে এটাই মনে হয় যে, বস্তুত মানুষ যা, তাকে তেমন করে এঁকে তোলার ক্ষমতাটাই এঁদের সাধ্যাতীত। তাঁরা বুঝতে পারছেন না, **অতিরঞ্জন যথার্থ শিল্পেরই অধিকার**; হারকিউলিসেরা, প্রমেথিউসেরা, ডন কুইকসোটেরা এবং ফাউস্টরা নেহাতই মনগড়া কতকগুলো চরিত্র নয়, বরং বাস্তব সত্যেরই সম্পূর্ণ বৈধ ও অপরিহার্য কাব্যিক অতিরঞ্জন মাত্র। আমাদের গল্প উপন্যাসে যা দেখা যায়, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির নির্মাতা, রক্তমাংসের বাস্তব মানুষেরা কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি মহৎ ও উঁচু মাপের।

সাহিত্যে সেই মানুষকেই আঁকা উচিত আরও অনেক সমুচ্চ ও মহীয়ান করে। এ শুধু জীবনসঞ্জাত একটি নির্দেশই নয়, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতারও অন্যতম দাবী—যে বাস্তবতার একটি শর্তই হল কোনো-না-কোনো কাল্পনিক প্রকল্পকে ঘিরে চিন্তা করে যাওয়া, যে কল্পনা-প্রকল্প বা অনুমান অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জনেরই সহোদরা।

খুব বেশি দিনের কথা নয়, মিরস্কি রচিত 'গ্রেট বৃটেনের বুদ্ধিজীবী সমাজ' নামে রীতিমত ক্ষুরধার ও কৌতূহলোদ্দীপক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থে ইংরেজ বুদ্ধিজীবী সমাজের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই সূত্রে অন্যান্য আরও পাঁচটা বিষয়ে বলতে গিয়ে এক জায়গায় মন্তব্য করা হয়েছে: 'সমাজ-ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করার কাজে অক্ষম বুর্জোয়ারা আজ নিজের স্বরূপটুকু জানার দিক দিয়েও অক্ষম হয়ে পড়েছে, এত দূরই অক্ষম হয়ে পড়েছে যে, এও আজ তার জানা নেই কোথায় সেই গ্রন্থি, যাকে ধরে টান দিলে বিকাশের পুরো যোগসূত্রটাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং এটা জানা না থাকার দরুন, এমনকি এরকম কোনো গ্রন্থি যে আদৌ থাকতে পারে তার বোধটুকুও না থাকার দরুন, নিজেদের মতামতের বাস্তব যাথার্থ্য কিংবা সারবত্তা, কোনোটাই আজ তার পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। নিজেদের মনগড়া ও বাছা বাছা কয়েকটি বিমূর্ত ধ্যানধারণা এবং খুশীমত বেছে নেওয়া কয়েকটি বর্গার্থের দিকে নিজের অক্ষম ও পক্ষাঘাতগ্রস্থ আঙুল উঁচিয়ে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণের গাড্ডায় আটকে থাকাটাই হল এর অবধারিত পরিণাম'*। অতিশয় খাঁটি কথা, বিশেষত সামাজিক আবর্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে।

ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের ধুলো আর মিথ্যা, সস্তা উদার 'মানবতাবাদের' মিথ্যাচার, এবং সম্প্রতিকালের ফ্যাসিবাদের স্থূল ধাপ্পাবাজির মধ্যে জীবনের রূঢ়-কঠিন ও অপ্রিয় 'সত্যগুলোকে' গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দেবার কাজে যুগ যুগ ধরে ব্যাপৃত থাকায় বুর্জোয়াদের সংবেদনশীলতা ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সাহিত্য সম্পর্কেও এ অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে যে, রূপান্তরের সূত্র অনুধাবনে এও অনিচ্ছুক, এবং ভাসাভাসা, অগভীর মূল্যায়নেই এর আসক্তি।

নতুন সংস্কৃতির নির্মাতা সোভিয়েতের মানুষ, আজ যেন হাজার হাজার কণ্ঠে চারদিক থেকে চীৎকার করে বলছে: আমি ছিলাম জনৈক মেষপালক, অথবা আইনের মুখে তুড়ি মারা কোনো সমাজবিরোধী কিংবা কুলাকদের ভাড়াটে গুণ্ডা—আর আজ সেই আমিই হয়েছি একজন ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনীয়ার, সুপণ্ডিত অথবা প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। আমি ছিলাম কোনো চাষার মেয়ে, কিংবা পরের বাড়ী খেটে মরা কোনো একজন দাসী অথবা আমার স্বামীর গৃহপালিত জন্তু—আর আজ সেই আমিই হয়েছি হয়ত কোনো দর্শনের অধ্যাপিকা নতুবা একজন কৃষি-বিশেষজ্ঞ অথবা একজন পার্টি সংগঠক, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এসব

* দ্য ইনটিলিজেনশিয়া অব গ্রেট বৃটেন, লণ্ডন, ১৯৩৫

বলার মধ্য দিয়ে তারা শুধু সমাজের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উন্নীত হওয়ার বাহ্য ঘটনার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, কিন্তু সেই রূপান্তরের পশ্চাতে যে ঘটনাপ্রবাহের রসায়ন ক্রিয়াশীল, তা উপলব্ধিতে তারা অক্ষম, এবং কখনো কখনো তা আলোচনায়ও অনাগ্রহী। এই রূপান্তরের মনস্তাত্ত্বিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া উন্মোচন করা বিপ্লবী শিল্পীর, 'মানবাত্মার ইঞ্জিনিয়ার'-এর দায়িত্ব।

একটা সামান্য ভাড়া-খাটা দিনমজুর থেকে সংস্কৃতির হোতা হয়ে ওঠার পেছনে যে ক্রিয়া প্রক্রিয়া, ঘটনার অন্তর্নিহিত যুক্তিপারম্পর্য, মনুষ্যেতর ভাবালুতায় আচ্ছন্ন পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরোধিতার মোকাবিলায় সর্বহারা শ্রেণীর জীবনাদর্শের যে নির্দিষ্ট ভূমিকা প্রবহমান—সেগুলোই উদ্ঘাটিত করতে হবে সোভিয়েত শিল্পী সাহিত্যিকদের।

ঘটনার সারমর্মটা এই নয় যে, একদা যে ছিল সামান্য একজন মেষপালক, সেই আজ বড় বড় যন্ত্রপাতি বানাচ্ছে অথবা কোনো খামারের চাষী হয়েছে কোনো একটি কারখানার পরিচালক। তাই যদি হয়, তবে এটাও তো ঘটনা যে, বৃহৎ বুর্জোয়ারাও আজ সংখ্যায় অনেক বেড়েছে ও আরও বাড়ছে—শুধু নিজেদের স্বাভাবিক জন্ম হারের মাধ্যমে নয়, কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবচেয়ে সুদক্ষ ও শক্তিশালী মানুষজনকে নিজেদের মধুচক্রের মাঝখানে টেনে এনেও সংখ্যা বাড়াচ্ছে তারা। শ্রমজীবী মানুষের জগতটা এত বড় যে, সর্বদাই এমন কিছু প্রতিভার সন্ধান সেখানে মেলে, যারা বিত্তবানদের সংস্কৃতির সেবাদাস হয়ে, শত্রু-শ্রেণীর ধমনীতেই অবিরত টাটকা রক্ত যুগিয়ে যায়; দুনিয়ার ওপরে এদেরই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়ে ওঠে। খুব কম সংখ্যক মানুষই রয়েছে, হয়ত কুল্লে ডজন কয়েক মাত্র, সর্বহারাদের যারা শ্রেণী সচেতন হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে, সজাগ করে তুলেছে তাদের নিজেদের বৈপ্লবিক অধিকার সম্পর্কে এবং সপ্রমাণ করেছে দারিদ্র্য ও শ্রমিকদের অধঃপতনের জনক বুর্জোয়া লুঠেরাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সংগ্রামের অনিবার্যতা।

সমকালীন ইউরোপ ও আমেরিকার কিছু কিছু লেখক শত্রু-শ্রেণীর শিবির থেকে খুঁজে বের করা প্রতিভাশালীদেরও বুর্জোয়ারা কিভাবে গ্রাস করে, সে বিষয়ে কিছু কিছু আলোকপাত করেছেন। এটা যে তারা করছেন তার হেতুটা এই যে, কোটি কোটি শ্রমিক কৃষককে জবাই করার অভিসন্ধিতে সারা দুনিয়া জুড়ে আরও একটা মারণযজ্ঞ সুসংগঠিত করার জন্য বদ্ধপরিকর ঐ সব বুর্জোয়াদের সঙ্গে ওঠা বসা করে, হাতে-দস্তানা, মাথায়-টুপি ঐ সব দুপেয়ে বুর্জোয়া জন্তুদের

সমাজে নিজেদের নাটকীয় অবস্থান প্রসঙ্গেও আজ ঐসব লেখকেরা সচেতন হয়ে উঠেছেন।

ক্ষেতে খামারের যে সমস্ত নারী-পুরুষের মধ্যে একদা গীর্জা ও পরিবার গত মর্যাদাবোধ, ধর্ম-ভাষা-বর্ণ-জাতি-উপজাতির জিগীর তুলে পারস্পরিক ভেদ-বিভেদ ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষ বাষ্প ফুলিয়ে তুলেছিল, সেইসব মানুষের মধ্যেই ক্রমে জার শাসিত রাশিয়ার সমস্ত জাতিগুলির প্রতি কিভাবে একটা সহজাত সর্বহারা সুলভ মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রী বোধের উন্মেষ হল, কিভাবে বহুজাতিভিত্তিক সোভিয়েত জনগণের মনে জেগে উঠল একটি মাত্র লক্ষ্য সামনে রেখে এক জোটে এগিয়ে যাওয়ার মনোভাব, নব জাগ্রত ঐ চেতনাই কিভাবে অবারিত ও প্রণালীবদ্ধ করে দিল নিত্য নতুন প্রতিভার বিকাশকে, কিভাবে জাগিয়ে তুলল জ্ঞানের বুভুক্ষা, শ্রমের বীরত্ব ও বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের সর্বহারার মহান আদর্শের জন্য যে-কোনো মুহূর্তে যে কোনো সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যত মনোভাব—এইসব সত্যকে প্রকাশ করাই আজ সোভিয়েত সাহিত্যের যুগোচিত কর্তব্য। দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণা কিভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতিও ঘৃণায় রূপান্তরিত হচ্ছে সেটা দেখিয়ে দেওয়াই আজকের সোভিয়েত সাহিত্যের একমাত্র বিষয়বস্তু। এই মৌলিক বিষয়ের মধ্যেই নিহিত আছে প্রকৃত বিপ্লবী সাহিত্যের উপযোগী অগুন্তি বিষয় বৈচিত্র্যের বীজ। এরই মধ্যে নিহিত আছে 'সদর্থক' তথা প্রকৃত বীর নায়ক চরিত্র সৃষ্টির এবং আমাদের যুগের একমাত্র 'ঐতিহাসিক সত্যেরও' উপাদান। এই সত্যের সারমর্ম হল—নিজেদের অবরুদ্ধ সৃজনশীলতাকে অবাধ ও উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য সারা দুনিয়া জোড়া রূপান্তর সাধনের সর্বহারা শ্রেণীর বৈপ্লবিক অঙ্গীকার।

সাহিত্যকর্ম ও যুদ্ধ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

অঁরি বারবুস

এ-দেশে ধারবাহিক ভাষণ দেবার সময় আমি বারবার জন রীডের মহান প্রতিমূর্তিকে মেলে ধরবার সুযোগ নিয়েছি। আজ জন রীড আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। তিনি এমন এক মানুষ, সারা আমেরিকার লেখক-শিল্পীদের কাছে যিনি অনিবার্য সম্মিলিত শক্তির পতাকাবাহী চিরায়ত পুরুষ। জন রীডের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় লাভের সৌভাগ্য আমার হয়নি। মস্কোর রেড স্কোয়ারে ক্রেমলিন প্রাচীরের গোড়ায় তাঁর স্মৃতিসৌধের মর্মর ফলকের সামনে মাথা নোয়ানো ছাড়া আমার বেশি কিছু করবার নেই। কিন্তু তাঁর মহান সৃষ্টি 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন' আমি পড়েছি। এ এমন এক বই, আমাদের পুরানো ইউরোপীয় দেশ-গুলোর জনমতকেও যা কাঁপিয়ে দিয়েছে। আর এই সৃষ্টিকর্মের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে আমি গভীরভাবে ওয়াকিবহাল।

জন রীড কোনো বিপ্লবী পরিবেশ থেকে উঠে আসেননি; বুর্জোয়া পরিবেশেই তিনি বড় হয়েছেন। আরো অনেকের মত তিনিও একজন শক্তিশালী লেখক এবং সাংবাদিক ছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে একজন মানুষ হিসেবে তাঁর একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা নানান ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হল, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন বিপ্লবী।

এই একই প্রক্রিয়া বিভিন্ন লেখকের ক্ষেত্রে ঘটেছে, বিশেষত এমিল জোলার ক্ষেত্রে। জোলা সবসময় যে-কোনো সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয় থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন সন্দিগ্ধ চিত্তে। কিন্তু যে-মুহূর্তে ড্রেফুস ঘটনাবলীর[১] টালমাটাল পরিবেশে নিজেকে তিনি জড়িয়ে ফেল্লেন, যে-মুহূর্তে সামরিকতন্ত্র আর ফরাসী ইহুদী-বিরোধিতার নিচাশয়তা ও নির্লজ্জতার সংস্পর্শে

তিনি এলেন, সে-মুহূর্তেই তিনি খোলাখুলিভাবে সামাজিক ক্রিয়ার পথে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করলেন। বস্তুত এই পথই সমাজতান্ত্রিক ক্রিয়ার পথ।

আর, আমি যদি মুহূর্তের জন্যেও এইসব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করি, দেখা যাবে আমার নিজের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। আমার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন এসেছিল যুদ্ধের যোগসূত্রে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে আমি ছিলাম ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবণতাসম্পন্ন বুর্জোয়া লেখক। জনমানসে প্রতিষ্ঠিত কিছু কিছু বিশেষ ব্যক্তির জীবনধারা সম্পর্কে অথবা কিছু কিছু বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করার রাস্তা আমি সব সময়ই এড়িয়ে চলতে চাইতাম। আর আমার চাওয়াটা সফলও হত। ঘটনাবলীর সেইসব আবর্ত আমি অনুসন্ধান করতাম যেগুলো কেবল বাহ্য ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী। ব্যক্তিমানুষের প্রতিচ্ছবির ভেতরে আমি সন্ধান করতাম এমন এক অসীম তটভূমি, প্রতিটি মানুষকে যা অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখে। সহজাত মার্কসীয় পূর্বদৃষ্টির ফলে একটা আবেগের, ধরা যাক, আবেগটি হল ভালবাসা, সমসাময়িক জটিলতার আড়ালে আমি বস্তুগত সূত্রের সন্ধান করতাম, যা এর মৌল উৎস ও সঞ্চালক।

উপরন্তু, ভাববাদী শান্তিকামনার শুভবোধের গভীর প্রবাহে আমি ছিলাম প্রভাবিত। মাতৃভূমির ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ আমার বই জাঁফে-তে প্রতিফলিত হয়েছে। বরং বইটি যে-সময় বেরিয়েছিল তখন তাকে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা হিসেবেই গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সমসাময়িক সামাজিক নরকের পরিধি ও গভীরতা সম্পর্কে আমি অনুসন্ধানী ছিলাম না।

বিশ্বযুদ্ধ মানুষ হিসেবে আমার শিক্ষাকে পূর্ণ করে তোলে। যুদ্ধ আমাকে বহু জিনিস বুঝতে বাধ্য করেছিল। তার মধ্যে অন্যতম এবং ভয়াবহও বটে, হল সমষ্টিগত অদৃষ্টের বিশাল ব্যাপকতা।

একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে অন্যান্য সৈনিকের সঙ্গে মিশে গিয়ে সামরিক পোশাকের আড়ালে মানব-সত্তার গভীরে বিবেক-যন্ত্রণার প্রথম জাগরণ আমি প্রত্যক্ষ করি। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতার ভেতরে এবং অন্তহীন যুদ্ধের চলচ্চিত্র-মাফিক শ্লথগতির আড়ালে আমি দেখেছি কিভাবে আমার চারপাশের মানুষেরা —সেইসব মানুষেরা যারা তথাকথিত 'সাধারণ জনগণ'-এর মধ্য থেকে, শ্রমিক কৃষকের মধ্য থেকে এসেছে—তারা কিভাবে ক্রমশ-বেড়ে-ওঠা অনিশ্চয়তা, সন্দেহ

আর অস্বস্তির কবলে একটু একটু করে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল। তারা নিজেদের প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল, আর এই ধরনের চির আবৃত্ত প্রশ্নগুলোর প্রথম প্রশ্ন ছিল: "কেন আমরা যুদ্ধ করছি?" এই কেন-র উত্তর তাদের জানা ছিল না। তাদের বলা হয়েছিল, বর্বরতার হাত থেকে সভ্যতাকে বাঁচাবার জন্য, জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে চূর্ণ করার জন্যই এই যুদ্ধ, যাতে করে এই যুদ্ধই সমস্ত যুদ্ধের শেষ যুদ্ধে পরিণত হয়। জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের এ-সব ঘোষণা ও প্রচারের আড়ালে লুকিয়ে-থাকা মরীচিকা আর মিথ্যে আস্তে আস্তে তারা ধরতে পারছিল। তারা বুঝতে শুরু করেছিল, তাদের যাবতীয় অতি-মানবিক ক্লেশ স্বীকার সবটাই নিরর্থক। তারা এমন এক উদ্দেশ্যের যন্ত্রমাত্রে ও শিকারে পরিণত হয়েছে যা তাদের নিজেদের তো নয়ই, বরং তাদের স্বার্থের পরিপন্থী।

আমার বই 'আগুনের নিচে' (ল্য ফ্য)-তে বিবেকের সেই মহান জাগরণের কাহিনীই বলা হয়েছে। কাদায় আর রক্তে অর্ধ-নিমজ্জিত আর ট্রেঞ্চের ভেতরে অর্ধ-সমাধিস্থ অসংখ্য সারিবদ্ধ মানুষ, যেন সব কবরের মধ্যে আবদ্ধ—তারা একে একে চোখ মেলছে—এদের ছবিই এই বইতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

যুদ্ধ চলাকালীন ঠিক মাঝামাঝি সময়ে একজন লেখক হিসেবে আমি প্রাক্তন সৈনিকদের সঙ্গে মিলে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। যুদ্ধের মাঝখানে, ১৯১৭ সালের গোড়ার মাসগুলোতে, যুদ্ধপ্রাঙ্গন থেকে সাময়িক অবকাশে-থাকা কিছু কমরেডদের সঙ্গে মিলে 'প্রাক্তন সৈনিকদের প্রজাতান্ত্রিক সমিতি' নামে একটি বিশেষ ধরনের সংগঠন আমরা গড়ে তুলি। প্রাক্তন সৈনিকদের এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থরক্ষা করা (যে-দুটো এই সংগঠনের অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে) কেবল সেটুকু করাই এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল না; যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করাও ছিল এর উদ্দেশ্য। যাতে করে আগামী প্রজন্মকে আমাদের মত যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়, এবং এই বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়েই সমস্ত যুদ্ধের অবসান হবে—এই বলে যে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি আমাদের দেওয়া হয়েছিল সেটা যাতে ঘটনাবলীর অনিবার্য পরম্পরায়, বলতে গেলে মানুষেরই আঘাতে সত্যি সত্যিই চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হয়, তাই ছিল আমাদের অভিষ্ট।

সাহিত্যকর্মী হিসেবে এবং সাহিত্যকর্মী হওয়া সত্ত্বেও আর একই সঙ্গে নিজের লেখার মাধ্যমে সাক্ষ্য দাখিল করতে সক্ষম প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমি এই

সংগঠনটিকে আন্তর্জাতিক রূপ দেবার জন্য উদ্যোগী হই। যুদ্ধের ঠিক পরে, ১৯২০ সালে, জেনিভাতে আমরা প্রাক্তন সৈনিকদের আন্তর্জাতিক গঠন করি। সেখানে ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ইংল্যাণ্ড, ইটালী আর আলসেস-লরেইন থেকে আমরা সব প্রাক্তন সৈনিকেরা মিলিত হয়েছিলাম। আমরা যারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরকে পেছু তাড়া করে বেড়িয়েছি তারাই পরস্পরের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম, কেউ কারো বিরুদ্ধে কখনো অস্ত্র ধরব না। শুধু তাই নয়, আমরা এও সিদ্ধান্ত নিলাম, কেবল যুদ্ধের সময়ই পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে মিলিত হব তা নয় (সেটা যত মধুরই হোক), যুদ্ধের আগেও এই কাজ আবশ্যিকভাবে আমাদের করে যেতে হবে। এই মর্মে একটি সনদ আমরা তৈরি করলাম। সেখানে বলা হল, যুদ্ধবিরোধী প্রচারকে যথার্থ কার্যকরী করতে হলে তাকে সামাজিক ভূমিতে নামিয়ে আনতে হবে, একে পরিচালনা করতে হবে যুদ্ধের অর্থনৈতিক তথা স্থায়ী কারণগুলোর বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

পরবর্তীকালে, 'যুদ্ধপ্রাঙ্গণের অন্তরালে' দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে আবার যখন জড়িয়ে ফেললাম, আরো বেশি বেশি করে পরিষ্কারভাবে আমি বুঝতে পারছিলাম, কিছু সংখ্যক শক্তিশালী পরগাছা এবং গুটিকয় বড় বড় শিল্পপতি আর রাজনীতিবিদদের লাভের অঙ্ক বাড়াবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নির্যাতিত ও নিহত সৈনিকদের ভাগ্য, আর সম্পূর্ণভাবে অপরের স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে যে সমস্ত শ্রমিক নিজেদের হাড়ভাঙা খাটুনির মধ্য দিয়ে ক্ষয় করছে তাদের ভাগ্য সম্পূর্ণভাবে এক। আমি সবশেষে বুঝতে পারলাম, যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়ানো প্রাক্তন সৈনিক সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর রক্তাক্ত প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই সময় প্রতিটি জায়গায় শাখা-প্রশাখা সহ বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করার এবং তাদের মদত দেবার কাজে আমি নিজেকে নিয়োজিত করলাম। ক্লার্তে[২] আন্দোলন ছিল এই ধরনের এক উদ্যোগ। এর উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত শ্রমিকদের স্বার্থে সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের একত্রিত করা। যুদ্ধ ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত প্রচার আন্দোলন ছিল এই ধরনের আর একটি সাংগঠনিক রূপ। আমস্টারডাম কংগ্রেস থেকেই এই সংগঠন জন্ম নিয়েছিল। এটি এমন একটি যুক্তফ্রন্টভিত্তিক আন্দোলন যাকে যুদ্ধবিরোধী জাতীয় কংগ্রেস (যে-কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) এই দেশে এক নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করবে।

এবার সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত সাহিত্যের কথায় আসা যাক। ভবিষ্যত

দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে আমরা এমন এক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী যে ঐতিহ্য প্রতিমুহূর্তে প্রবহমান কালের ভেতর থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছে, এবং যার বৈশিষ্ট্য হল সাহিত্য প্রকরণের ক্ষেত্রে বেশি বেশি করে অখণ্ড বাস্তবকে, প্রকৃত বস্তুবাদকে আত্মস্থ করা।

আমার শেষদিকের বইগুলোর মধ্যে একটিতে এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমি কিছু কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম, মানুষের মানসিক ভুবনে প্রথমাবস্থায় (১) জাগতিক বিষয় ও জীবন, এবং (২) এই বিষয়গুলোর ব্যাখ্যার মধ্যে একধরনের অবিমিশ্র ব্যবধান সৃষ্ট হয়। অর্থাৎ কিনা, একটি পৃথিবী আছে যেখানে জীবন নিজেকে ভাঁজে ভাঁজে মেলে ধরছে, আর, একটি স্বর্গ আছে যেখানে নানান্ বিষয়ের কার্যকারণগুলো নিশ্চিতরূপ খুঁজে পাওয়া যায়; আর আছে এক অতল গহ্বর যা এই দুটোকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। বলা যেতে পারে, যুগ যুগ ধরে ধাবিত মানবিক প্রগতির বৈশিষ্ট্য হল অস্তিত্বের তাগিদ আর ঘটনার অন্তরালবর্তী হেতুসমূহকে অতিপ্রাকৃত স্তর থেকে প্রাকৃতিক স্তরে, অতীন্দ্রিয়বাদ থেকে যুক্তিবাদে, স্বর্গ থেকে মর্ত্যে সংগঠিত করা।

বিজ্ঞানের অনুসরণে সাহিত্যও এই একই রকম বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে এসেছে। খুব বেশি দূরে নয়, শুধুমাত্র বিগত শতকে পেছিয়ে গেলেই, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমরা লক্ষ্য করি। প্রথম হল, রোমান্টিকতা। সম্পূর্ণতা, বালসুলভ মনোভঙ্গি এবং প্রায়শঃ প্রত্যক্ষ গীতিময়তা সত্ত্বেও এই রোমান্টিকতা ধ্রুপদী কবিতার শীতল, সংকীর্ণ অবয়বের মধ্যে সুগভীর উষ্ণ ভাবোচ্ছ্বাস নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়—বাস্তববাদ। রোমান্টিকতার জমির ওপর বালজাকের হাতে এর স্বাস্থ্যকর গোড়াপত্তন এবং পরবর্তীকালে ফ্লবেয়ারের হাতে স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহণ। তৃতীয় অধ্যায় হল, জোলার যথাযথবাদ বা ন্যাচারেলিজম্।

এখন বাস্তববাদকে আরো এক ধাপ এগিয়ে যেতে হবে। তাকে সামাজিক ব্যাপ্তি পেতেই হবে। সবার আগে, পেশাদারী মর্যাদার জন্য একে এই বিস্তৃতিটুকু আমাদের দান করতেই হবে। লেখক হিসেবে আমাদের কাজ হল, আমাদের কালকে রূপায়িত করা। আর, যদি আমরা সত্যনিষ্ঠ হতে চাই, জীবনকে শুধু পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ফুটিয়ে তোলা নয়, তাকে তার সামগ্রিকতায় আমাদের ধরতে হবে। জীবনের বিশাল পরিধি, এর পরিব্যাপ্ত সামাজিক প্রবাহ যা পৃথিবীকে পাল্টে দিচ্ছে, তাকে প্রকাশ করতেই হবে আমাদের। আর যেহেতু আমরা

ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ের প্রতিফলন ও আন্তর গরজকে রূপান্বিত করবার দায়িত্বে ব্রতী হয়েছি, সেই হেতু আমরা কখনই এই সত্যকে উপেক্ষা করতে পারি না (এমন কি উপেক্ষিত হতে দিতেও পারি না) যে, এমন এক কেন্দ্রবিন্দুতে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি যেখানে মানবজাতিকে কেবল প্রগতির স্বার্থেই নয়, মানবগোষ্ঠীর অনিবার্য পরিত্রাণের জন্যও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

ভালবাসার, আকাঙ্ক্ষার, বার্ধক্যের আর মরণের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী—এগুলো হল মানবহৃদয়ের চিরন্তন ট্রাজেডির উপাদান। এই ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি থেকে বা সতর্কতার সঙ্গে সামান্য রূপান্তর সহ তাদের উপস্থিত করা থেকে একজনের বিরত থাকাটাই আজকের দিনে বড় কথা নয়। (এগুলো যত মর্মস্পর্শী আর মহৎ হোক না কেন, সবসময়ই তা শ্রেষ্ঠতম রচনার উপাদান হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে, আবর্তিত হয়েছে একই চক্রে—নিষ্ফলতায় যার পরিসমাপ্তি। ব্যক্তিমানুষের ভাগ্য সব সময়ই শেষ হয়েছে বিষাদময় পরিণতিতে—মৃত্যুতে।) আজ কিন্তু আমাদের সমষ্টিগত নাটকের আঙিনায় এসে দাঁড়াতে হবে। ব্যক্তিমানুষের নাটকের চাইতে সামষ্টিক নাটক অনেক বেশি চিত্তহারী। মৃত্যুতে এ পরিসমাপ্ত হয় না। মঞ্চে এক নতুন নায়কের অভ্যুত্থান আমাদের ঘটাতে হবে। সর্বাধিক ক্ষমতাশালী এই নায়কের নাম : জনগণ।

কিছুদিন আগে আকাশচারণার বিষয়ে একটি উপন্যাস আমি লিখেছিলাম। বিমানে আকাশে ওড়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সময় ব্যয় করার ফলে যন্ত্র-সভ্যতার এই ফসলটি আমার মনে জীবন সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্বোধন ঘটায়। কেউ যখন আকাশে অনেকটা ওপরে উঠে যায়, কোনো মানুষই তখন আর বিচ্ছিন্নভাবে তার নিকট ধরা পড়ে না ; আলাদা করে কোনো একটা বাড়িও তার নজরে পড়ে না। তার চোখে তখন শুধু অসংখ্য ঘনবদ্ধ মানুষ। সেই উচ্চতা থেকে একটি শহরের মানুষ নতুন ও সংহত রূপ ধারণ করে। মানচিত্রে যে বিমূর্তভাবে দেখানো আছে ঠিক সেভাবে পৃথিবীর সীমারেখা কেউ দেখতে পায় না। বরং, কথাটাকে অন্যভাবে বললে বলা যায়, সমস্ত দেশগুলো যেন রক্তমাংস নিয়ে গড়ে-ওঠা এক ভৌগোলিক অবয়বে রূপ পায়। এই হল পৃথিবীর প্রকৃত সত্যরূপ। বিশ্বের বড় বড় অংশগুলোর শুধু বাহ্যরূপ দেখানোই যথেষ্ট নয়, তাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটুকুও আমাদের দেখাতে হবে।

কিন্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভুলের সম্ভাবনা থেকে যায়। স্কুলের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের একবার এক যুদ্ধের চলচ্চিত্র দেখানো হচ্ছিল ফরাসীতে।

দর্শক হিসাবে তাদের মধ্যে আমিও সেখানে হাজির ছিলাম। শান্তির সপক্ষে প্রচার করাটাই ছিল প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। যুদ্ধক্ষেত্রগুলোর নারকীয় ধ্বংস-যন্ত্রণা এবং মৃত আর মৃতপ্রায় শরীরগুলোর হৃদয়বিদারক বীভৎস হাত-পা চালনার দৃশ্য বাস্তব সত্যতায় দর্শকদের অভিভূত করছিল। কিন্তু, প্রদর্শনীটি দেখে, 'শত্রু'র বিরুদ্ধে মুখোমুখি অবস্থানে নিজেদের অনুভব ক'রে, জার্মানবিরোধী অন্ধ দেশপ্রেমের আবেগে ঘৃণার প্রবাহিত স্রোতে অল্প-বয়েসী দর্শকেরা ভেতরে ভেতরে একটা মানসিক আলোড়ন অনুভব করছিল। একথা সন্দেহাতীত, শিল্পকর্ম প্রকৃতিগতভাবে তার নিজস্ব সত্তা থেকেই অন্তর্নিহিত শক্তি অর্জন করে। এক্ষেত্রে কোনো কৃত্রিম প্রত্যক্ষ প্রচারের প্রয়োজন হয় না। পুনশ্চ বলা যায়, এটা কিন্তু আবশ্যিক, একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় এমন এক পদ্ধতিতে সংগ্রহ করতে হবে যাতে বাহ্য দৃশ্যের অথবা দুঃসাহসিক ঘটনার অন্তর্নিহিত প্রবণতাগুলো সুস্পষ্ট আকার লাভ করে এবং ভ্রান্ত ব্যাখ্যানের কোনোরকম সম্ভাবনা প্রশ্রয় না পায়।

লেখক হলেন জনসাধারণেরই একজন। আমি প্রায় সবসময় এই পদ্ধতির অনুসারী হয়েই চলেছি; আর, এখনও তাকেই অনুসরণ করতে চাই। লেখক জনসাধারণের একজন কেননা তাঁর সৃষ্টিকর্ম লেখার ঘরের চার দেয়ালের ভেতরে শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে আটকে থাকতে পারে না। সেখান থেকে তাকে বেরিয়ে এসে যত বেশি সম্ভব মানুষের ভেতরে ছড়িয়ে পড়তে হবে। নিজেকে প্রতারণা করবার কোনো অধিকার লেখকের নেই। কেননা, নিজেকে প্রতারিত করে তিনি অন্যদেরও প্রতারিত করেন। লেখক, তিনি কিছু পরিমাণে জনমতকে প্রভাবিত করতে পারেন, তাঁকে তো জনমতকে তুলে ধরতেই হবে। আর, মানব প্রজাতি আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে এই জনমত আজও কতই না অস্থির, কতই না অনিশ্চিত।

দীর্ঘদিন ধরে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে লালিত সাধারণ অজ্ঞতা এবং বোঝাপড়া থেকে নিজেদের মুক্ত করে লেখকেরা যখন সচেতন হচ্ছেন, তখন সমাজব্যবস্থার ভাঙাগড়ার কারিগরদের দলে তাঁদের ভিড়তেই হবে। তাঁদের যুক্ত হতে হবে সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে—শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে। আর এই শ্রেণী, আর আমাদের বর্তমান দিনগুলোতে একমাত্র এই শ্রেণীই পারে এক ভয়াবহ নরককুণ্ড ধ্বংস-প্লাবনের দিকে ঠেলে-দেওয়া ভবিষ্যতের হাত থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করতে।

আপনাদের কাছে আমি এখন যা বলছি, আমার মনে পড়ছে, রাশিয়ায় কিছু

বুদ্ধিজীবীর কাছে সে কথাগুলোই অল্প কয়েক বছর আগে আমি বলেছিলাম। আমি যে কথাটা মূলত তাদের কাছে বলেছিলাম সেটা হচ্ছে, বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের কোনো আলাদা গোষ্ঠী গড়ে তোলা উচিত নয়। কেননা বুদ্ধিজীবীদের কাছে পৌঁছোনোর দায়িত্বটা সর্বহারাশ্রেণীর নয়, বরং সর্বহারাশ্রেণীর কাছে যাওয়াটাই বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব।

আমরা নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে সকলে একমত, শিল্পীকে একজন শিল্পী হিসেবেই গড়ে উঠতে হবে। শ্রমবিভাজনের অনুশাসনীয় প্রয়োজনে প্রত্যেককেই তাদের নিজেদের কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে হয়। রাজনৈতিক বিশ্বাসকে জীবিকা হিসাবে বই-এর পাতার সঙ্গে যুদ্ধ করে রাখবার কোনো সুযোগ এখন নেই। বরং খোলাখুলিভাবে, নির্দ্বিধায়, সততার সঙ্গে লেখকেরা শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের পাশে এসে দাঁড়াক, তাঁদের স্থান হোক অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের পাশে।

লেখকদের কাছে এবং অল্পবয়েসী যারা লেখক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে চান তাদের কাছে আমার বক্তব্য : যুদ্ধ এবং ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়া জুড়ে যুক্ত-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কার্যকর সংকল্প এবং বিবেকের যে ব্যাপক গণঅগ্রগতি আমরা গড়ে তুলেছি, সেখানে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে-কোনো ভূমিকা আপনারা গ্রহণ করুন। যতদিন পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে যাবে, সাহিত্যকে তার সংগ্রামী অগ্রগামী বাহিনীর মধ্য দিয়ে অকুতোভয় হতেই হবে। যতদিন না এক ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে—যেখানে যুদ্ধ ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার টিকে থাকবার আর কোনো কারণই থাকবে না এবং এগুলো হয়ে দাঁড়াবে কেবল অতীতের অপচ্ছায়া, ততদিন ক্রান্তিদর্শী ও প্রতিবাদী সাহিত্যকে এই পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতেই হবে।

অনুবাদ : অমল চক্রবর্তী

অনুবাদের টীকা :

(১) আলড্রফ ড্রেফুস (১৮৫৯—১৯৩৫) ফরাসী সামরিক বাহিনীর একজন জেনারেল ছিলেন। জাতিতে ইহুদি। ১৮৯৪ সালে জার্মানীর কাছে কিছু গোপন সামরিক তথ্য সরবরাহ করার অভিযোগে তাঁকে দক্ষিণ আমেরিকার এক নির্জন দ্বীপে অন্তরীণ করা হয়। ১৮৯৬ সালে জানা গেল, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সবই সাজানো ও মিথ্যে। সংবাদপত্রে যখন এ খবর বেরুল তখন সারা দেশে এক প্রচণ্ড আলোড়ন ওঠে। এমিল জোলা, আনাতোল ফ্রাঁসের মত বুদ্ধিজীবী এবং ক্লেমাঁসোর মত রাজনীতিবিদগণ ড্রেফুসের পক্ষে

জোরদার আন্দোলন শুরু করেন। চাপে পড়ে তদানীন্তন প্রজাতান্ত্রিক সরকার তাঁকে ফিরিয়ে আনেন কিন্তু পরে আবার দশ বছরের জন্য জেলে পাঠান। ইহুদী বিরোধিতার বিরুদ্ধে আন্দোলন তবু অব্যাহত থাকে। শেষে ১৯০৬ সালে ড্রেফুস মুক্ত হন এবং সামরিক বাহিনীতে উচ্চতর পদে নিযুক্ত হন।

(২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে কিছু ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বারবুস ক্লার্তে লেখকগোষ্ঠীর পত্তন করেন। সঙ্ঘের মুখপাত্র হিসেবে ১৯১৯ সালে ক্লার্তে নামে পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। অল্পকাল পরে ইংল্যাণ্ড জার্মানী এবং ইওরোপের কয়েকটি দেশে এর শাখা কমিটি গঠিত হয়। মার্শাল মার্তি, আনাতোল ফ্রাঁস, ক্যুতরে প্রমুখ এর ফরাসী শাখার নেতৃস্থানীয় পদে ছিলেন। ব্রিটিশ শাখা কমিটিতে রবার্ট ডেল, এইচ. জি. ওয়েলস, আলডুস হাক্সলি, টমাস হার্ডি প্রমুখরা ছিলেন।

আমাদের নতুন সাহিত্য প্রসঙ্গে কিছু ভাবনা

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

লু স্যুন

এখন থেকে এক বছরেরও বেশী সময়ের মধ্যে যুবকদের কাছে আমি খুব অল্প ভাষণ দিয়েছি, কারণ বিপ্লবের সময় থেকে ভাষণ দেবার সুযোগ ছিল অতি অল্প। আপনারা হয় প্ররোচক না হয় প্রতিক্রিয়াশীল, এর কোনটাই কারো মঙ্গল করে না। যাহোক এবার বেইজিং-এ ফিরে আসার পর, আমার কিছু পুরোনো বন্ধু আমাকে এখানে এসে কয়েকটি কথা বলার জন্য বলেছিলেন এবং তাদের ফিরিয়ে দিতে না পারায় আমি আজ এখানে এসেছি। কিন্তু কোন না কোন কারণে, আমি কী বলব আদৌ ঠিক করিনি—এমনকি কী বিষয়ে বলব তাও ঠিক করিনি।

বাসে করে এখানে আসার সময় একটা বিষয় ঠিক করব বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু রাস্তা এতই খারাপ যে রাস্তা থেকে বাস এক ফুট উঁচুতে লাফিয়ে উঠছিল, ফলে মনস্থির করা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। সেই সময়ই আমার চিন্তা হল যে বিদেশ থেকে কোন জিনিস সরাসরি আরোপ করলে কোন কাজে আসে না। যদি আপনার বাস থাকে, আপনার ভাল রাস্তাও থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি জিনিসই তার পারিপার্শ্বিকের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য, এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য—চীনে যাকে নতুন সাহিত্য, বা বিপ্লবী সাহিত্য বলে তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আমরা যত দেশপ্রেমীই হই না কেন, সম্ভবতঃ আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের সভ্যতা বরং অনগ্রসর। যা কিছু নতুন তা আমাদের কাছে এসেছে বিদেশ থেকে এবং আমরা বেশীরভাগ লোকই নতুন শক্তিগুলো দেখে হতচকিত।

বেইজিং এখনও এরকম হয়ে ওঠেনি, কিন্তু উদাহরণ হিসাবে, শাংহাইয়ের আন্তর্জাতিক সেটেলমেন্ট-এ আপনারা দেখে থাকবেন যে বিদেশীদেরকে মাঝখানে রেখে ঘিরে রয়েছে দোভাষী, গোয়েন্দা, পুলিশ, 'বালকেরা' এবং আরোও অনেকে যারা তাদের ভাষা বোঝেন এবং বিদেশী সুযোগ-সুবিধার নিয়মকানুন জানেন। সাধারণ মানুষরা এই পরিবেষ্টনের বাইরে আছেন।

যখন সাধারণ মানুষেরা বিদেশীদের সংস্পর্শে আসেন, তারা জানতেই পারেন না কী ঘটছে। যদি একজন বিদেশী বলেন "হ্যাঁ" তার দোভাষী বলেন: "উনি আমাকে তোমার কানে ঘুসি মারতে বললেন।" যদি বিদেশী বলেন 'না', একে অনুবাদ করা হয় "এ ব্যাটাকে গুলি কর।" এই ধরনের অর্থহীন ঝামেলা এড়াবার জন্য আপনার আরও জ্ঞানের দরকার, কারণ তখনই আপনি এই পরিবেষ্টনকে ভেঙে এগোতে পারবেন।

বিদ্বৎ-জগতেও এই একই ব্যাপার। আমরা জানি খুবই কম, এবং আমাদের শিক্ষায় সাহায্য করার মতো খুব কমই আছে আমাদের রসদ। লিয়াং শি-কিউর আছে তাঁর ব্যাবিট, জু ঝিমোর আছে তাঁর টেগোর, হু শির আছে তাঁর ডিউই—আর হ্যাঁ, জু ঝিমোর ক্যাথারিণ ম্যান্সফিল্ডও আছেন, কারণ তিনি তাঁর কবরের কাছে গিয়ে কেঁদেছিলেন—এবং ক্রিয়েশন স্কুলের আছে বিপ্লবী সাহিত্য, যে সাহিত্য এখন চলেছে। কিন্তু যদিও একই সাথে বেশ ভালই লেখা চলছে, পড়াশোনা খুব বেশী হচ্ছে না। আজ পর্যন্ত, এখনও বেশ কয়েকটা বিষয় আছে যা সেই সব মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যাঁরাই প্রশ্নগুলো করে থাকেন।

সমস্ত সাহিত্যই তার পারিপার্শ্বিকের দ্বারা গঠনপ্রাপ্ত হয়, এবং যদিও শিল্পপ্রেমীরা দাবি করতে চান যে সাহিত্য বিশ্ব ঘটনাবলীর ধারাকে চালিত করতে পারে, সত্য ঘটনাটি হচ্ছে যে প্রথমে আসে রাজনীতি এবং সেই অনুসারে শিল্পের পরিবর্তন ঘটে। যদি আপনি কল্পনা করেন যে শিল্প আপনার পরিবেশকে পরিবর্তিত করতে পারে, আপনি তাহলে একজন ভাববাদীর মতো কথা বলছেন। পণ্ডিতদের আশানুরূপ ঘটনা খুব কমই ঘটে। সেই কারণেই একটি মহান বিপ্লবের পূর্বে তথাকথিত বিপ্লবী লেখকেরা নিষ্প্রভ হয়ে যান। যখন বিপ্লব সফল হতে শুরু করবে, এবং জনগণ পুনরায় শান্তির নিশ্বাস ফেলার সময় পাবেন, তখনই কেবল বিপ্লবী লেখক জন্মাবেন। এর কারণ যখন পুরোনো সমাজ ধ্বংসের মুখে এসে যায়, আপনি তখন প্রায়শঃই এমন লেখা দেখতে পাবেন,

যা মনে হবে বিপ্লবী, কিন্তু তা আসলে সত্যিকারের বিপ্লবী সাহিত্য নয়। যেমন, কোন ব্যক্তি পুরানো সমাজকে ঘৃণা করতে পারেন, কিন্তু তাঁর কেবল ঘৃণাই আছে—ভবিষ্যতের কোন স্বপ্ন নেই। তিনি হয়ত সমাজ-সংস্কারের জন্য শোরগোল করতে পারেন, কিন্তু যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন কীরকম সমাজ তিনি চান, তিনি যা বলবেন সেটা দেখা যাবে একটি অবাস্তব কল্পনা। অথবা তার বেঁচে থাকাটা ক্লান্তিকর মনে হতে পারে, এবং তার অনুভূতিগুলোকে উত্তেজিত করার জন্য তিনি কোন বিরাট পরিবর্তনের কামনা করতে পারেন, ঠিক যেমন খাদ্য ও মদে ভরপুর কোন ব্যক্তি তার ক্ষুধাকে তীব্র করার জন্য গরম গোলমরিচ খান। তারপরও আছে সেইসব পুরানো প্রচারকরা যারা জনগণের দ্বারা পদদলিত হয়েছিল, কিন্তু যারা নতুন বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল পদমর্যাদা অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন নতুন শক্তির উপর নির্ভর করে।

চীনে লেখকদের এমন ব্যাপারও আছে যে তারা বিপ্লবের জন্য সানন্দে প্রতীক্ষা করেন, কিন্তু একবার বিপ্লব এসে পড়লে তারা নীরব হয়ে যান। কুইং রাজবংশের শেষে সাউথ ক্লাবের সদস্যরা একটি উদাহরণ। বিপ্লবের জন্য উত্তেজিত সেই সাহিত্য গোষ্ঠী হানদের কষ্টে অনুশোচনা করেছিল, মাঞ্চুর অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং 'অতীতের সুন্দর দিনগুলো' ফিরে আসার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর তাঁরা একেবারে চুপ মেরে গিয়েছিলেন। আমার ধারণা, এর কারণ বিপ্লবের পর 'প্রাচীন জাঁকজমকপূর্ণ দিন পুনঃপ্রবর্তিত হবে' এটাই ছিল তাদের স্বপ্ন—সেই পুরানো অফিসারদের উঁচু টুপি ও চওড়া বেল্টের দিন। যেই ব্যাপারগুলো অন্যরকম ভাবে ঘটল এবং বাস্তবটা তাঁদের কাছে অরুচিকর বলে মনে হল, তাঁরা আর লেখার কোন স্পৃহা বোধ করলেন না। রাশিয়াতে এর চেয়েও পরিষ্কার উদাহরণ পাওয়া যাবে। অক্টোবর বিপ্লবের শুরুতে বহু বিপ্লবী লেখক আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই ঘূর্ণিঝড়কে স্বাগত জানিয়েছিলেন, ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন সেই ঝড়ে নিজেকে পরীক্ষিত করার জন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে কবি ইয়েসেনিন ও ঔপন্যাসিক সোপোলি আত্মহত্যা করেছিলেন, এবং সম্প্রতি তাঁরা বলেন যে বিখ্যাত লেখক এরেনবুর্গ যেন প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছেন। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে তাঁদের উপর দিয়ে যা বয়ে যাচ্ছে তা তুফান নয়, এবং যা তাঁদের পরীক্ষা করছে তা ঝড় নয়, বরং তা একটি প্রকৃত, সৎ বিপ্লব। তাঁদের স্বপ্ন চুরমার হয়ে

গেছে, তাই তাঁরা আর বেঁচে থাকতে অক্ষম। সেই পুরানো বিশ্বাসের মতো এটা অত সুন্দর নয় যে, আপনি যখন মারা যান আপনার আত্মা স্বর্গে যায় এবং ঈশ্বরের পাশে বসে কেক খায়*। কারণ নিজের আদর্শ অর্জন করার আগেই তাঁরা মারা গিয়েছিলেন।

অবশ্য তারা বলেন, চীনে ইতিমধ্যেই একটি বিপ্লব হয়ে গেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা হতেও পারে, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে হয়নি। কেউ কেউ বলেন, 'পেটি-বুর্জোয়াদের সাহিত্য এখন তার মাথা খাড়া করছে।' সত্যি কথা বলতে কি, এরকম কোন সাহিত্য নেই; এই সাহিত্যের উঁচু করার মতো কোন মাথাই নেই। আমার পূর্বের কথা বিচার করলে, সাহিত্যে কোন পরিবর্তন বা যুগান্তর ঘটেনি এবং তা বিপ্লব অথবা প্রগতির কোনটাই প্রতিফলিত করে না, তা বিপ্লবীরা যেমন চান তেমনই ক্ষুদ্র।

ক্রিয়েশন সোসাইটির দ্বারা প্রচারিত আরো বেশী মৌলিক বিপ্লবী সাহিত্য—সর্বহারার সাহিত্যের সম্পর্কে বলা যায় তা নিছকই শূন্যগর্ভ কথা। ওয়াং ডুক্‌ইং-এর যে কবিতা এখানে সেখানে ও সর্বত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তা লেখা হয়েছিল শাংহাইয়ের আন্তর্জাতিক সেটেলমেন্টে, যখন তিনি বিপ্লবী ক্যান্টনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন তখন। কিন্তু তাঁর আরও বড় হরফে প্রকাশিত 'পঙ, পঙ, পঙ!' দেখে শুধু মনে হয় শাংহাইয়ের সিনেমার পোস্টার ও সয়াবীনের চাটনীর বিজ্ঞাপনের প্রভাব তাঁর উপর পড়ছে। তিনি ব্লকের 'টুয়েলভ'-এর অনুকরণ করেছেন, কিন্তু ব্লকের মতো তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিভা নেই। বহু লোক গুয়ো মরুও-এর 'হাত'-কে চমৎকার লেখা বলে মত দিয়েছেন। এতে আছে কিভাবে একজন বিপ্লবী বিপ্লবের পরে তার একটি হাত হারিয়েছিল, কিন্তু তার অপর হাত দিয়ে সে তখনও তার প্রেয়সীর হাত ধরতে পারত—অবশ্যই অতি সুবিধাজনক ক্ষতি! যদি আপনার চারটি হাত পা-এর যে কোন একটাকে খোয়াতে হয়, তবে হাতই নিশ্চয় সবচেয়ে দামী ক্ষতি। পা-এর ক্ষতি অসুবিধাজনক হ'ত, তার চেয়েও বেশী একটি মাথার। এবং আপনার একটি হাতই যদি শুধু হারাবার আশংকা থাকে, লড়াইয়ের জন্য আপনার খুব বেশী সাহসের প্রয়োজন হয় না। অবশ্য আমার ধারণা একজন বিপ্লবীর এর চেয়ে অনেক বেশী ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এক দরিদ্র পণ্ডিতের বিচার নিয়ে লেখা

---

* এখানে হাইনের 'ঘরে ফেরা' কবিতার অংশ 'আমি স্বপ্ন দেখি আমিই ঈশ্বর' এর উল্লেখ করা হয়েছে।

'হাত' একটা অতি পুরানো গল্প, যেখানে পরিণতিতে সে প্রথাসিদ্ধভাবে রাজ-প্রাসাদের পরীক্ষায় পাস করে ও একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা চীনের আজকের পরিস্থিতির একটি প্রতিফলন। শাংহাইয়ে অধুনা-প্রকাশিত একটি বিপ্লবী সাহিত্য রচনায় মলাটে যে ত্রিশূল ছাপা আছে সেটা 'দুঃখের প্রতীক'*-এর মলাট থেকে নেওয়া, এর মাঝের শূলে বসানো হাতুড়ি সোভিয়েতের পতাকা থেকে নেওয়া। এই সহাবস্থানের অর্থ হচ্ছে আপনি ত্রিশূল দিয়ে ভেদ করতে পারবেন না, আবার হাতুড়ি দিয়েও আঘাত করতে পারবেন না, এবং এতে শুধুমাত্র শিল্পীর মূর্খতাই প্রকাশ পায়—এটা এই সব লেখকদের জন্য ব্যাজ হিসেবে ভাল ব্যবহার করা যায়।

অবশ্যই এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে খোলাখুলিভাবে আপনার মতামত বলা, যাতে জনগণ জানতে পারে আপনি বন্ধু না শত্রু। আপনার নাকের ওপর নাটকীয়ভাবে আঙুল তুলে এবং 'আমিই একমাত্র সত্যিকারের সর্বহারা!' এই দাবি করে, এই সত্যকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন না যে আপনার মাথা পুরানো আবর্জনায় পরিপূর্ণ। লোকেরা এমনই অতি স্পর্শকাতর যে 'রাশিয়া' শব্দ শুনলেই তাঁরা প্রায় হার্টফেল করেন, আর অচিরেই তাঁরা এমনকি ঠোঁট লালও করতে দেবেন না। তাঁরা সবরকম প্রকাশনাকেই ভয় পান। এবং আমাদের বিপ্লবী লেখকেরা, যাঁরা বিদেশ থেকে আরও তত্ত্ব বা বই আনাতে অনিচ্ছুক, তাঁদের দিকে নাটকীয়ভাবে আঙুল তুলে দেখান এবং অবশেষে কুইং রাজবংশের শেষের দিকের 'রাজ-পরোয়ানার তিরস্কার' জাতীয় কিছু আমাদের উপহার দেন—আর সেগুলো যে কী, সে সম্পর্কে কারোরই কোন ধারণা নেই।

সম্ভবতঃ আমাকে আপনাদের কাছে 'রাজপরোয়ানার তিরস্কার' কথাটি ব্যাখ্যা করতে হবে। এটা সম্রাটের আমলের ঘটনা, যখন, কোন পদস্থ কর্মচারী ভুল করলে তাকে কোন গেট বা অন্য কিছুর বাইরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে আদেশ করা হোত, আর তাকে আচ্ছা করে গালিগালাজ করার জন্য সম্রাট একজন খোজাকে পাঠাতেন। খোজাটিকে ঘুস দিলে সে তাড়াতাড়ি থেমে যেত। অন্যথায় সে আপনার প্রাচীন পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার পর্যন্ত সমগ্র পরিবারকে অভিসম্পাত দিতে থাকত। ধরে নেওয়া হত যে সম্রাটই এ সব বলছেন,

সাহিত্য সমালোচনার উপরে লেখা হাকুসন কুরিয়াগাওয়ার বইটি জাপানী ভাষা থেকে লু স্যুন কর্তৃক অনূদিত।

কে সাহস করে সম্রাটকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন যে সত্যিই তিনি এ সব বলতে চান কি না? একটি জাপানী পত্রিকায় প্রকাশ যে গতবছর জার্মানীতে গিয়ে নাটক নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য চেং ফাং-উ চীনের কৃষক ও শ্রমিক কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবং তিনি সত্যিই সেইভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন কিনা সেটা খুঁজে পাওয়ার কোন উপায়ই আমাদের নেই।

সেই কারণেই আমি সব সময়ে যেমন বলে থাকি, যদি আমরা আমাদের উপলব্ধির ভুবন বিস্তৃত করতে চাই, আমাদের চতুর্দিকের বেষ্টনী ভাঙার জন্য আমরা অবশ্যই আরো বেশী বিদেশী বই পড়ব। এটা আপনাদের পক্ষে খুব কঠিন নয়। যদিও নতুন সাহিত্যের ওপর খুব বেশী ইংরিজি বই নেই এবং খুব বেশী ইংরিজি অনুবাদও নেই, তবুও যে অল্প কয়েকটি আমাদের আছে সেগুলো মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। আরো অনেক বিদেশী তত্ত্ব ও সাহিত্যের বই পড়বার পরই যখন আপনারা আমাদের নতুন চীনা-সাহিত্য বিচার করতে যাবেন, তখন আরো অনেক পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন। আরোও ভাল হয়, যদি আপনারা চীনে এই সব লেখা পরিচিত করাতে পারেন। জোলো লেখা দূর করার চেয়ে অনুবাদ করা সহজ নয়, কিন্তু আমাদের নতুন সাহিত্যের বিকাশের জন্য এর অবদান অনেক মহৎ এবং আমাদের জনগণের কাছে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়।

প্রতিভাবানের প্রতীক্ষায়

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

লু স্যুন

আজকাল লেখক আর শিল্পীদের কাছে চিৎকার করে যত অনুরোধ জানানো হয়, তার মধ্যে আমার ধারণা সবচেয়ে জোরালোটি হল একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিকে চাই, এই দাবী। এর থেকে দু'টো জিনিষ প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ এই মুহূর্তে চীনে কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি নেই আর, দ্বিতীয়তঃ, আমাদের আধুনিক শিল্পকলা সবাইকে ক্লান্ত ও অসুস্থ করে তুলেছে। সত্যিই কি প্রতিভাবান ব্যক্তি কেউ নেই? হয়তো আছে, কিন্তু আমরা এমন কাউকে দেখিনি, কেউই দেখেনি। কাজেই নিজেদের চক্ষু ও কর্ণের সাক্ষ্য অনুযায়ী বলা যেতে পারে, শুধু যে প্রতিভাবান কেউ নেই তাই নয়, একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির জন্ম দেবার মতো ক্ষমতা ধরে তেমন জনসাধারণও নেই।

প্রতিভা তো প্রকৃতির কোন খেয়ালিপনা নয় যে আপনা থেকে গভীর অরণ্যে বা জনশূন্য প্রান্তরে জন্ম নেবে। জনসাধারণের এক বিশেষ অংশই প্রতিভাকে সৃষ্টি করে ও তার লালন পালন করে। সেই রকম জনসাধারণ না থাকলে কোন প্রতিভা থাকতেই পারে না। আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করার সময় নেপোলিঅন একবার ঘোষণা করেছিলেন 'আমি আল্পসের চেয়েও উচু।' কী বীরত্বপূর্ণ উক্তি। কিন্তু তাঁর পেছনে তখন কত সৈন্য ছিল সেকথা ভুলে গেলে চলবে না। এই সৈন্যদল না থাকলে তাঁকে স্রেফ শত্রুদলের হাতে ধরা পড়তে হত, নয়তো তাড়া খেয়ে উলটো দিকে পালাতে হত। তখন কিন্তু তাঁকে বীরের মতো তো লাগতই না, উল্টে তাঁর আচরণ দেখে তাঁকে উন্মাদ বলে মনে হত। এইজন্যেই আমার মতে একজন প্রতিভাধরের আবির্ভাব ঘটবে এই প্রত্যাশা নিয়ে বসে না থেকে এখন আমাদের এমন জনসাধারণকে আহ্বান

জানানো উচিত যাদের পক্ষে একজন প্রতিভাবানের জন্ম দেওয়া সম্ভব। সুন্দর গাছ আর মনোহারী ফুল পেতে হলে যেমন প্রথমে আমাদের ভাল মাটি তৈরী করে নিতে হয় আর কি। মাটিটা কিন্তু ফুল বা গাছের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মাটি বিনা কিছুই জন্মাতে পারেনা। ফুল ও গাছের পক্ষে মাটি ততটাই অপরিহার্য যেমন নেপোলিঅনের পক্ষে অপরিহার্য ছিল সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী।

কিন্তু তবু আজকাল যে সব ঘোষণা শোনা যাচ্ছে ও প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তার বিচারে প্রতিভাবানকে পাবার জন্য এই যে দাবী জানানো হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা। যে মাটিতে প্রতিভাবান জন্ম নিতে পারে, পারলে সেই মাটিকেই তো অনেকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিতেও রাজী। কয়েকটা উদাহরণ দিই এবার।

প্রথমে 'জাতীয় সংস্কৃতির অধ্যয়ন' এর কথা ধরা যাক। চীনে কোনদিনও নতুন চিন্তাভাবনার তেমন কোন প্রবেশ না ঘটলেও অনেক নির্বোধ বৃদ্ধ এবং তরুণরাও ইতিমধ্যে যেন প্রাণভয়ে শিউরে উঠেছে এবং জাতীয় সংস্কৃতির বুলি কপচাতে শুরু করেছে। 'চীনে ভাল জিনিস অনেক আছে।' বলে তারা আমাদের আশ্বস্ত করে। 'প্রাচীনকে অধ্যয়ন না করে, সংরক্ষণ না করে, শুধু নতুনের পিছু ধাওয়া করাটা আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার মতোই নিন্দনীয় ব্যাপার।' অবশ্য একটা সিদ্ধান্ত চড়িয়ে দেবার জন্যে পূর্ব-পুরুষদের রাস্তায় টেনে এনে তাদের দিয়ে কুচকাওয়াজ করাতে পারলে যে দারুণ চাপ সৃষ্টি করা যায়, কথাটা খুবই সত্যি। কিন্তু তা বলে একটা পুরোনো কোর্তাকে ধোলাই করে পাট করে তুলে রাখার আগে কোন নতুন জামা তৈরী করা যায় না, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা।

বর্তমানে অবস্থা যা তাতে যে-যার খুশী মতো চলতে পারে। যে সব প্রাচীন-পন্থী ভদ্রলোক জাতীয় সংস্কৃতি অধ্যয়ন করতে চায় তারা স্বচ্ছন্দে তাদের দক্ষিণের বাতায়নে মৃত পুঁথি খুলে বসে থাকতে পারে। তরুণরাও ইচ্ছে করলে বর্তমানকে নিয়ে, আধুনিক শিল্প নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে। যতক্ষণ যে যার নিজের ঝোঁক অনুযায়ী চলবে ততক্ষণ তেমন কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু আর পাঁচজনকে নিজের ধ্বজার তলায় জমা করার অর্থ হবে কিন্তু চীনকে চিরদিনের জন্য অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। প্রত্যেকের কাছে এই একই দাবী জানানো তো আরোই বিস্ময়কর। আমরা যখন কিউরিও* বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলি তারা

* প্রাচীন দ্রব্য বিক্রেতা।

স্বাভাবিক ভাবেই নিজেদের প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পণ্যের প্রশংসা করে। কিন্তু তা বলে তারা পূর্বপুরুষদের কথা বিস্মরণ হয়ে গেছে বলে, চিত্রশিল্পী, কৃষক, শ্রমিক এবং বাদবাকী মানুষকে অভিযুক্ত করে না। এই কিউরিও বিক্রেতারা অবধি বহু প্রাচীন পণ্ডিতদের তুলনায় ঢের বেশী বুদ্ধি ধরে।

তারপর ধরুন 'মৌলিক সাহিত্যকর্মের উপাসনা'র কথা। বাহ্যত মনে হয় প্রতিভাবানের জন্য দাবী জানানোর সঙ্গে এই কথাটার সঙ্গতি আছে। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। এরই মধ্যে চিন্তা জগতের ক্ষেত্রে উগ্র জাতীয়তাবোধের লক্ষণ রয়েছে পুরো মাত্রায়। এটাও চীনকে আন্তর্জাতিক চিন্তাস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। টলস্টয়, টুর্গেনিভ্ এবং ডস্তয়েভস্কির নাম শুনে শুনে যদিও অনেক লোক ইতিমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু এইসব লেখকদের ক'টা বই চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে? যারা আমাদের নিজেদের দেশের সীমানার বাইরে নজর দেয়না, পিটার এবং জন, এই নামগুলো অপছন্দ করে, শুধু তৃতীয় চাঙ্ এবং চতুর্থ লি'র কথা পড়ে, তারাই হচ্ছে মৌলিক সাহিত্য-স্রষ্টা। আসলে এদের মধ্যে সেরা যারা, তারা শুধু শ্রেষ্ঠ বিদেশী লেখকদের কাছ থেকে কিছু কারিকুরি বা প্রকাশভঙ্গি ধার করেছে। তাদের রচনাশৈলীর যতই চাকচিক্য থাক, অন্তর্বস্তুর বিচারে তা অনূদিত সাহিত্যের ধার-কাছেও ঘেঁষে না। অনেক সময় তারা আবার সনাতন চীনা মেজাজের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যে অনেক প্রাচীন ধারণা লেখার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। পাঠকরা তাদের এই ফাঁদে ধরা পড়ে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত তারা শুধু পুরোনো জগতের মধ্যেই আটকা পড়ে। যা কিছু অচেনা তাকে ধ্বংস করার জন্যে, জাতীয় সংস্কৃতিকে গৌরবান্বিত করার জন্যে, লেখক এবং পাঠক যখন এই রকম একটা ভ্রমাত্মক আবর্তের মধ্যে শুধুই ঘুরপাক খায় তখন প্রতিভার জন্ম হবে কি করে? কোন প্রতিভা যদি দেখাও দিত, তার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হত না। এই ধরনের জনসাধারণ মাটির মতো নয়, ধুলোর মতো, কোন অপরূপ ফুল বা সুন্দর গাছ এখানে জন্ম নিতে পারে না।

এবার ধ্বংসাত্মক সমালোচনার কথা ধরা যাক। বহুদিন থেকেই সমালোচকদের প্রয়োজনের কথা বলে আসা হচ্ছিল এবং এখন তাদের অনেকেই আবির্ভূত হয়েছে। দুঃখের কথা এদের মধ্যে অনেকেই সত্যিকারের সমালোচনা না লিখে শুধু চিৎকার করে, আর অভিযোগ করে। এদের কাছে কোন লেখা পাঠানো মাত্র এরা মহা রুষ্ট হয়ে কালি বেটে নিয়ে মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করেই লিপিবদ্ধ করে

৫

এক পরম নিদান : "আরে, এতো স্রেফ্ ছেলেমানুষি। এখন চীন চায় প্রতিভা।" তারপর যারা সমালোচক নয় তারাও এদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে একই বিক্ষোভ জানায়। আসলে একজন প্রতিভা তার জন্মলগ্নে প্রথম যখন কেঁদে ওঠে, তখন তার সঙ্গে একজন সাধারণ শিশুর কান্নার কোন প্রভেদ থাকে না। প্রতিভাবানের পক্ষেও সেই মুহূর্তে সুন্দর একটি কবিতা উপহার দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু ছেলেমানুষি বলেই কোন কিছু যদি পায়ে করে পিষে ফেলা হয়, তাহলে তার পক্ষে শুকিয়ে মরাটাই তো স্বাভাবিক। আমি দেখেছি শুধু গালমন্দের ভয়েই কত লেখক নীরব হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এদের মধ্যে প্রতিভাবান কেউ ছিল না, তবু সাধারণদেরও আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই।

ধ্বংসাত্মক সমালোচকেরা কোমল মুকুলদের পদদলিত করে খুব মজা পায় এবং কী সাধারণ, কী প্রতিভাবান কোমল মুকুল মাত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছেলেমানুষি লজ্জাকর ব্যাপার নয়। লেখার মধ্যে ছেলেমানুষি ও পরিণতি যা, মানুষের জীবনে শৈশব ও পরিণত বয়সও তাই। ছেলেমানুষের মতো শুরু করেছে বলে কোন লেখকের লজ্জা পাবার কথা নয় কারণ তাকে যদি পায়ে করে পিষে ফেলা না হয় তাহলে ক্রমেই সে পরিণতি লাভ করবে। একমাত্র দুরারোগ্য হল অবক্ষয় এবং দুর্নীতি। যারা শিশুর মতো (এদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা বয়সে প্রবীণ কিন্তু হৃদয়বৃত্তির দিক থেকে শিশু), ব্যক্ত করুক না তারা শিশুসুলভ ভাবেই তাদের কথা। শুধু নিজেদের খুশী করার জন্যেই তারা বলুক না কথা। আর কথা বলা শেষ হবার পর, এমন কী ছাপাও যদি হয় তো তারপর আর তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কোন প্রয়োজন নেই সমালোচকরা কে কি বলছে দেখার। তা সে সমালোচক যে-ধ্বজাই বহন করুক না কেন।

আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি এই বর্তমান সভায় উপস্থিতদের মধ্যে দশভাগের নয় ভাগ নিশ্চয় একজন প্রতিভাবানের আবির্ভাব ঘটবে প্রত্যাশা করেন। কিন্তু তবু বর্তমানে অবস্থা যা তাতে একজন প্রতিভাবানের আবির্ভাব ঘটা যেমন কঠিন তার চেয়েও কঠিন সেই মাটি সংগ্রহ করা যে-মাটিতে প্রতিভাবান জন্মাবে। প্রতিভাবানরা জন্ম গ্রহণ করে, তাদের গঠন করা যায় না। তাই আমার ধারণা প্রতিভার পুষ্টির জন্যে আমরা যে-কেউ ওই মাটির অংশ হতে পারি। প্রতিভাবানকে চাই বলে দাবী না জানিয়ে আমাদের বরং অবিলম্বে মাটি সংগ্রহ করা অনেক বেশী প্রয়োজন। তা না হলে আমরা যদি শতেক প্রতিভাও পাই তারা মাটির অভাবে শেকড় গাড়তে পারবে না। থালার ওপর বয়বটি গাছ বসালে যেমন হয় আর কি!

মাটি হতে হলে আমাদের মনকে আরো উদার করতে হবে। অর্থাৎ নতুন চিন্তাধারাকে গ্রহণ করতে হবে ও পুরনো শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে যাতে আগামী দিনের প্রতিভাদের আমরা মান্য ও প্রশংসা করতে পারি। তাছাড়া কোন কাজকেই ছোট বলে দেখা চলবে না। মৌলিক সাহিত্যস্রষ্টারা এক নাগাড়ে লিখে যাবে আর অন্যথা সময় কাটাতে অনুবাদ করবে, সাহিত্য পড়বে, উপভোগ করবে এবং প্রবর্তন করবে। সাহিত্যকে সময় কাটানোর জন্য ব্যবহার করার কথা বললে শুনতে হয়তো অদ্ভুত লাগে কিন্তু তবু বলব সাহিত্যকে পদদলিত করার চেয়ে এও ভাল।

প্রতিভার সঙ্গে অবশ্যই মাটির তুলনা করা চলে না কিন্তু আমরা যদি না নিরন্তর চেষ্টা করি, সব রকম কষ্ট স্বীকার করে নিই, তাহলে কিন্তু এই মাটি হওয়াও শক্ত। মানুষের প্রয়াসের ওপরই সবকিছু নির্ভর করে, তাই ঈশ্বরপ্রেরিত প্রতিভাবানের জন্যে বসে না থেকে এভাবে চললেই আমাদেরই সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী। এই প্রয়াসের মধ্যেই রয়েছে মাটির ক্ষমতা, তার বিপুল সম্ভাবনা, এমন কী শেষ পুরস্কারটি পর্যন্ত। মাটি থেকে যখন এক অপরূপ পুষ্পমুকুল মাথা তোলে তখন তাকে যে-ই দেখে সে স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দ পায়, স্বয়ং মাটিও তার ব্যতিক্রম নয়। খুশীতে প্রাণ ভরে ওঠার জন্য নিজেকেই ফুল হতে হবে তার কোন মানে নেই। অবশ্য মাটির যদি সেই চেতনা থাকে তবেই।

বিপ্লবের যুগের সাহিত্য

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

লু স্যুন

আজকে যা নিয়ে দুচার কথায় আলোচনা করতে চাই তা হ'লো 'বিপ্লবকালীন সাহিত্য'। এই শিক্ষায়তন থেকে ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, কিন্তু আমিই টালবাহানা করি আসতে। কেন? আমার ধারণা, কিছু লিখে আমার লেখক পরিচিতি প্রাপ্তির পরই আমাকে এই শিক্ষায়তনের যাবতীয় আমন্ত্রণের ঘটা। তাঁরা আমার মত একজন লেখকের কাছে সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা শুনতে চান। প্রকৃতপক্ষে আমি তো সাহিত্যিক নই, পরন্তু সাহিত্যের আদ্যোপান্ত কিছুই বুঝি না। আমি প্রথম জীবনে খনিজ-বিদ্যা নিয়ে কিছু লেখাপড়া করি। অতএব আমাকে খনি থেকে খনিজ-পদার্থ উত্তোলনের বিষয়ে কিছু বক্তৃতা দিতে বললে সেটাই বরং সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা অপেক্ষা গুণগত বিচারে অনেক ভাল হবে। সত্যিই, সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকায় প্রায়ই সাহিত্য-বিষয়ক বইগুলো পড়ি। বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তিদের কাছে যেগুলো সমাদৃত, বলতে পারি, সেগুলো থেকেই আমি সব শিক্ষা গ্রহণ করিনি। এই কবছরে পিকিঙে যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, সেই অভিজ্ঞতাই আমাকে অদ্যাবধি প্রাপ্ত সাহিত্য-বিষয়ক সকল জ্ঞানের সম্বন্ধে সন্দিহান করে তুলেছে। যখন ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়, সাহিত্য-কর্মের ওপর বাধা-নিষেধের খড়্গ নেমে আসে তখন স্বাভাবিকভাবেই মনের কোণে উঁকি দেয় একটি কথা—সাহিত্য! সাহিত্য! অতি অপদার্থ বস্তু! দুর্বলচেতা ভীরু মানুষের দল সাহিত্যের সুধারস পান করে মত্ত। পরাক্রমশালী অত্যাচারীর দল নিশ্চুপ, নির্বাক। তারা দমন-পীড়ন করতেই ব্যস্ত। এদিকে

নিপীড়িত মানুষগুলো যখনই কিছু উচ্চারণ করে বা কলমের খোঁচায় মনের গোমরানি ভাষায় প্রকাশ করে তখনই তাদের মাথা কাটা যায়। আর যারা সৌভাগ্যবশত নিজের নিজের ঘাড়ের ওপর মাথাগুলোকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে তারা প্রতিদিন হাজার বার আর্তরব তুলে, লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তিক্ত গুঞ্জন তুলে, অধিকারের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত কোলাহল সৃষ্টি করে পীড়নকারীকে পীড়নের দণ্ড ব্যবহার করা থেকে নিরস্ত করতে পারে না। সে নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়ে যায়। নিধন যজ্ঞের পৈশাচিক উল্লাসে মেতে ওঠে। কোন উপায়ে তাদের সঙ্গে যোঝার ক্ষমতা থাকে না। যে লেখার মধ্যে কেবল এই আর্তি, গুঞ্জন, কিচির-মিচির সুর বেজে ওঠে সে লেখা কি কোনভাবে অসহায়-অত্যাচারক্লিষ্ট মানুষকে সাহায্য করে?

প্রাকৃতিক জগতে দেখি, বাজপাখী যখন চড়ুই পাখীকে তীক্ষ্ণ ঠোঁটে কামড়ে ধরে বা বিড়াল যখন তার শিকার ইঁদুরকে যন্ত্রণা দেয় তখন চড়ুই পাখী বা ইঁদুরের অসহায় চিঁ চিঁ ডাকে বাজপাখী বা বিড়াল বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। পরন্তু ধীরে সুস্থে নীরবে সদ্য-ধরা শিকারকে উদরস্থ করে। সাহিত্যিকগণ যখন হাজার সৎপ্রচেষ্টা নিয়েও এধরনের সাহিত্য রচনা করেন তখন সম্ভবত তাঁরা সুনাম অর্জনের আকর্ষণেই এরকমটি করেন অথবা যুবশক্তির কাছে মিথ্যা জৌলুষের সস্তা বাহারের মায়াজাল সৃষ্টি করেন। একটা উদাহরণ দিয়ে এটা বোঝানো যায়। মনে করা যাক, কোন শহীদের স্মৃতির উদ্দেশে আহুত সভায় নামীদামী সাহিত্যিকগণ সমবেত হয়ে শহীদের উদ্দেশে আপন আপন শোকগাথার অর্ঘ্য উপহার দিচ্ছেন। তখন দেখা যায়, শোকগাথা রচনায় কে কার ওপর টেক্কা মারতে পারছেন তারই প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেছে। আর যাঁকে ঘিরে তাঁদের সমাবেশ অর্থাৎ সেই শহীদ বেচারী তাঁদের প্রতিযোগিতার দাপটে হারিয়ে যাচ্ছেন। এটা একটা জমজমাট ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মনে হয় এই ধরনের বিপ্লবী সাহিত্যিকগণ সাহিত্য ও বিপ্লবের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা চেঁচিয়ে বলে পরম তৃপ্তি পান। তাঁরা মনে করেন, হয়ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে, প্রচারের মধ্য দিয়ে, উচ্চকণ্ঠে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বিপ্লবের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন এবং এই ভাবেই অবশেষে বিপ্লবকে সফল করে তুলতে পারবেন। কিন্তু আমি মনে করি, এ ধরনের সাহিত্যের কোন শক্তি নেই। কারণ মহৎ সৃষ্টি কারও আদেশের অপেক্ষা রাখে না। দমন-পীড়নের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। পরন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হৃদয়ের অন্তরতম স্থান

থেকে সৎ উপলব্ধিগুলো বেরিয়ে এসে লেখায় রূপান্তরিত হয়। যদি প্রথমেই একটা বিশেষ ধরনের চিন্তা মগজে ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়ে তবে লেখার মধ্যে নেহাৎ একঘেয়েমির সুর বেজে ওঠে। সাহিত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে তাকে নিতান্ত মূল্যহীন বোধ হবে। আদপে তা মানুষের মনে সাড়া জাগাতে পারলো কিনা তার প্রশ্নই ওঠে না। বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলে ধরার জন্য আবশ্যক 'বিপ্লবী মানুষের' বিপ্লবী সাহিত্যের জন্য তড়িঘড়ির প্রয়োজন নেই। বিপ্লবীগণ বিপ্লবী কাজের মধ্য দিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করেন তার থেকেই জন্ম নেবে বিপ্লবী সাহিত্য। সুতরাং আমার মতে এইখানেই লুকিয়ে আছে বিপ্লব ও বিপ্লবী সাহিত্যের আসল আন্তঃসম্পর্ক। বিপ্লবকালীন সাহিত্য ও শান্তির যুগের সাহিত্য অবশ্যই এক বস্তু নয়। বিপ্লবের কালে সাহিত্যের জগতেও ঘন ঘন রঙ বদলের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বড় ধরনের বিপ্লবই পারে সাহিত্যের চেহারা বদলাতে। ছোটখাট বিপ্লবাত্মক আন্দোলন তা পারে না। কারণ তার কাছে বিপ্লবের সম্যক্ ধারণা স্পষ্ট না হওয়ায় সাহিত্যের রঙ বদলানোর ক্ষমতাও সে অর্জন করতে পারে না। এ জায়গায় 'বিপ্লব' শব্দটা শুনে শুনে সকলে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। চিয়াংসু, চ্য' চিয়াঙে 'বিপ্লব' শব্দটা শোনামাত্র মানুষের হৃদ্‌কম্প সুরু হয়। আর যাঁরা বিপ্লবী কথাবার্তা বলেন তাঁরা বিপদের জালে জড়িয়ে পড়েন। আসলে কিন্তু বিপ্লব বস্তুটি দুর্লভ—এমন মনে করার কারণ নেই। বস্তুত এই বস্তুটির জীবনস্পর্শে সমাজের এত রূপান্তর সাধিত হয়েছে। মানুষ এগিয়ে চলেছে। এরই স্পর্শে এককোষী প্রাণী থেকে মানুষের ক্রমবিবর্তন, বর্বর জীবন থেকে সভ্য সমাজে উত্তরণ। এক মুহূর্তের জন্যও এটি থমকে থাকেনি। জীববিদগণ বলেন, 'মানুষ ও বানরজাতীয় প্রাণীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য নেই। বলা যেতে পারে আদিতে তাদের মধ্যে জ্ঞাতি-ভাই সম্পর্ক ছিল।' কিন্তু মানুষ কেন 'মানুষ' হ'ল, আর জ্ঞাতি-ভাই বানরজাতীয় প্রাণীরা আদিম অন্ধকারে রয়ে গেল? কারণ বানরজাতীয় প্রাণীরা পরিবর্তিত হবার জন্য সচেষ্ট হয়নি। তারা চার পায়ে চলতে-ফিরতেই পছন্দ করতো। হয়ত এরই মধ্যে কোন একটা প্রাণী সোজা হয়ে দাঁড়ালো, দুপায়ে ভর করে হাঁটতে চাইলো। কিন্তু বেশীর ভাগ অভিমত দিল, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে ভাবে দিন কাটিয়েছেন আমরাও সেই ভাবেই দিন কাটাতে চাই, পরিবর্তনের কিবা প্রয়োজন?' যারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইলো তাদের গিলে খাবার ভয় দেখানো হ'ল। তারা না চাইলো সোজা হয়ে দাঁড়াতে, না চাইলো কথা বলা অভ্যাস করতে, কারণ তারা ছিল পুরোদস্তুর

রক্ষণশীল মেজাজের প্রাণী। মানুষের ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। সে ঋজু দেহে চলাফেরা করা, কথাবলা আয়ত্ত করা—এসব কাজে আত্মনিয়োগ করে। ফলে তারাই প্রকৃতিতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে কালক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠার লড়াই, আজও অব্যাহত গতিতে চলেছে। সেজন্যই বলি, বিপ্লব কদাচিৎ প্রাপ্ত বস্তু নয়। বরঞ্চ যে সব জাতি আজও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি তারা প্রতিনিয়ত বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করে আছে। যদিও তাকে বিপ্লবাত্মক (বা ছোটখাট) আন্দোলন নামে অভিহিত করা সঙ্গত।

মহাবিপ্লব ও সাহিত্যের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবের চেহারাটা কি? মোটামুটি তিনভাগে এটিকে বিভক্ত করে দেখালে কথাটা স্পষ্ট হতে পারে,—

(১) **প্রাক্-বিপ্লব যুগ**। এ যুগের সাহিত্যে মূল যে সুরটা ধ্বনিত হয় তাকে কটা কথার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। নানান সমাজব্যবস্থার হরেক রকমের অবিচার যন্ত্রণার উপলব্ধি রূপান্তরিত হয় ভাষায়, যে ভাষার মধ্যে নিনাদিত হয় দুঃখকষ্টজনিত সোচ্চার বিলাপ, অন্যায়-অবিচারজনিত কূজন-গুঞ্জন। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের সাহিত্য প্রচেষ্টা বিরল নয়। কিন্তু এই বিলাপ, আর্তরব ও অবিচারের বিরুদ্ধে চীৎকার কোনক্রমেই বিপ্লবকে প্রভাবিত করতে পারে না। কারণ এর মধ্যে ক্লীবত্বই প্রকাশ পায়। যারা দমন পীড়ন করে চলেছে তারা এতে দৃক্‌পাতও করে না। বিড়ালের মুখের শিকার ইঁদুর প্রাণভয়ে যতই চিঁ চিঁ করুক বিড়াল তাকে খুশীমত উদরস্থ করে। তেমনি সাহিত্যগুণের দিক থেকে যত ভালই সাহিত্য রচনা হোক না কেন যদি তার মধ্যে কেবল অবিচারের বিরুদ্ধে আর্তের অসহায় চীৎকার ফুটে ওঠে তবে অত্যাচারীর কাছে তার লাঞ্ছনার শেষ থাকে না। আবার যে জাতি কেবল মিনতি, কান্না, আর ক্ষীণস্বরের প্রতিবাদ সম্বল করে সাহিত্য সৃষ্টি করে, বুঝতে হবে তারা হতাশার চরমে পৌঁচেছে। মোকদ্দমায় যেমন বিজিত পক্ষ যখন আপন অভিযোগের ফিরিস্তি নিয়ে হাজির হয় তখন বিজেতা স্পষ্টই বুঝতে পারে প্রতিপক্ষের দম ফুরিয়ে আসছে এবং ঘটনাও দ্রুত-সমাপ্তির দিকে। ঠিক এমনিই, সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন কান্নার রোল তুলে কেবল অভিযোগ আনা হয়, অভিযোগ-সম্বলিত বিবৃতি পেশ করা হয়, তখন তা দেখে পীড়ক পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কারণ সে জানে এই ধরনের লেখার মধ্যে আসলে কোন ধার নেই। কিছু জাতির মধ্যে এ ধরনের নিরীহ অভিযোগ পেশ করার প্রবণতা ছিল। আজ তাদের সেই ক্ষমতাটুকুও নেই। আর তাই শেষে একটা অব্যক্ত তুষ্ণীভাব এসে তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

ক্রমশ তারা পতনের পেছল পথে পড়ে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। ঈজিপ্ট, আরব, পারস্য, ভারত—এইসব দেশগুলোর কণ্ঠস্বর আজ আর শোনা যায় না। যে সব জাতির মধ্যে প্রতিরোধের দৃপ্ত মেজাজ লুকিয়ে আছে, আর আছে অমিত-বিক্রম, যারা বুঝেছে অযথা কান্নায় উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, তারাই আজ জেগে উঠেছে। বিলাপকে হু-হুঙ্কারে পরিণত করেছে। হুঙ্কার ধ্বনিতে উজ্জীবিত সাহিত্য যদি একবার আত্মপ্রকাশ করে তবে প্রতিরোধের শক্তি দুর্বার-দুর্জয় হয়ে ওঠে। যেহেতু তারা ঘৃণা-ক্রোধকে চিনতে শিখেছে তাই বিপ্লব যখন ফেটে পড়ে তখন তাদের সৃষ্টিতেও ক্রোধ-ঘৃণার সুস্পষ্ট ছাপ পড়ে। তখন তারা যেমন প্রতিরোধ করতে চায় তেমনই প্রতিশোধও নিতে চায়। রাশিয়াতে বিপ্লবের কালে কিছু কিছু এধরনের সাহিত্যের সন্ধান মেলে। কিন্তু আবার এর ব্যতিক্রমও আছে। তা হ'ল পোল্যাণ্ড। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া যখন গোটা দেশকে তরমুজের ফালির মত কেটে কেটে নিজের পাতে টেনে নিতে থাকে, তখন সে দেশে স্বদেশপ্রেমের আগুনে জলে উঠে A. Mickiewicg, J Slowacki, প্রমুখ কবিগণ প্রতিশোধ গ্রহণের ডাক দিয়ে পৌরুষদীপ্ত কবিতা লেখেন। তবে তাঁদের ক্ষেত্রে অবশ্য ইউরোপের যুদ্ধগুলো সহায়কের ভূমিকা নেয়।

(২) বিপ্লবের সময়ে সাহিত্যের অভাব, অভাব সাহিত্যানুরাগী কণ্ঠস্বরের। বিপ্লবী জোয়ারের উদ্দামতায় সকলে আপ্লুত। এতদিনের রণধ্বনির আজ অনুশীলন করার উপযুক্ত সময় এসেছে। বিপ্লবের কাজে যখন সকলে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, তখন ফুরসৎ কোথায় সাহিত্য নিয়ে চিন্তা করার? এর আরও একটা দিক আছে। এসময়ে সব জিনিসে টান ধরে। সমস্ত মনজুড়ে একমুঠো অন্নের চমৎকার চিন্তা। এখন কি আর সাহিত্য ভাবনার বিলাসিতা চলতে পারে? প্রাচীনপন্থীরা বিপ্লবের কশাঘাতে অর্ধমৃত হয়ে পড়েন। তাঁদের সাহিত্য-আলোচনা শিকেয় ওঠে। কেউ কেউ বলেন, 'সাহিত্যের সৃষ্টি চরম যাতনার মধ্যে'। বাস্তব ক্ষেত্রে সচরাচর তা নয়। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বা যাতনার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। আমি যখন পিকিঙে ছিলাম, 'হা' ভাত 'হা' ভাত করে তখন আমার দিন কাটতো। অর্থচিন্তা এতই প্রধান হয়ে ওঠে যে এক কলমও লেখার সুযোগ পেতাম না। ঐ যখন হাতে মাস-মাইনেটা পেতাম, পেটের চিন্তা কমতো, তখনই টেবিলের সামনে বসে মন-মাথা এক করে কাগজের বুকে কলমের খোঁচায় সৃষ্টি করতাম কিছু লেখা। কাজের ব্যস্ততায় যদি সময় কেটে যায় তবে সাহিত্য সাধনার সময় কোথায় পাওয়া যায়?

বাঁকী বাঁক বইতে বইতে কি কিছু লিখতে পারে? কিছু লেখার আগে তাকে বাঁকটা নামিয়ে রাখতে হবে, অন্তত দুদণ্ড জিরোতে হবে, তবে লেখার কথা সে চিন্তা করতে পারবে। রিক্সাচালক রিক্সাটানার সাথে সাথে নিশ্চয়ই লেখার কাজ করতে পারে না। তাকেও বিশ্রাম নিয়ে তবে লেখার কথা ভাবতে হবে। তাই বিপ্লবের মহা উৎসবের দিনে যখন সকলের মধ্যে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়, যখন তার মধ্যে কায়মন ডুবে থাকে, এপক্ষের সঙ্গে ওপক্ষের লড়াই চলে, তখন অবশ্যই ঘন ঘন পরিবর্তনের পটভূমিকা সৃষ্টি হয়। এই অস্থির কালে সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করার সময় কোথায়? এই কারণেই বিপ্লবের মহা তোলপাড়ের দিনে সাহিত্য সাধনা সাময়িক কালের জন্য ছেদ পড়ে।

(৩) **সফল বিপ্লবের পরবর্তী কাল।** শান্তি ফিরে আসে। মানুষের জীবনে আসে স্বস্তি। এটাই হল সাহিত্য সৃষ্টির উপযুক্ত কাল। একালে দুধরনের সাহিত্য প্রচেষ্টা দেখা দেয়,—(ক) বিপ্লবকে আবাহন করে, বিপ্লবের উদ্দেশে স্তুতিগান করে সাহিত্য প্রচেষ্টা সুরু হয়। প্রগতিশীল সাহিত্যিকগণ উপলব্ধি করেন সমাজের অগ্রগতি। প্রাচীন সমাজব্যবস্থার ধ্বংস ও নতুন সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠনের মধ্যে একটা সার্থকতাকে খুঁজে পান। একদিকে অতীতের জীর্ণ কাঠামোটা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাওয়ায় উল্লাস প্রকাশ করেন, আর একদিকে পুনর্গঠনের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে নতুনের উদ্দেশে স্তবগান করেন। (খ) প্রাচীন সমাজের ভগ্নদশা দেখে একদল সাহিত্যিক রচনা করেন, 'অন্ত্যেষ্টিগাথা'। এটাও বিপ্লবোত্তর কালের আর এক বিশেষ সাহিত্য প্রচেষ্টা বলে গণ্য হতে পারে। কেউ কেউ বলেন, এগুলি 'প্রতি বিপ্লবী সাহিত্য কর্ম'। কিন্তু আমার মতে তাঁদের প্রতি এত নিষ্ঠুর না হলেও চলে। বিপ্লবের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সমাজের সব মানুষেরা রাতারাতি নতুন মানুষে পরিবর্তিত হন না। তাছাড়া নতুন যুগে প্রাচীন মানুষদের অনেকেই বেঁচে থাকেন। তাঁদের মগজ জুড়ে অতীতের সুখস্বপ্ন তখনও সজীব। তাঁদের সর্বাঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে সুরু করে। আর যতই এটা পড়তে থাকে ততই তাঁরা বিগতদিনের চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়তে চেষ্টা করেন। অতীত স্মৃতি-চারণের দুরন্ত আকর্ষণ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন না। এই সব কারণেই তাঁদের সৃষ্টিতে স্মৃতির রোমন্থন ছাপিয়ে ওঠে। তাঁদের হৃদয়ের অশান্তি মর্মরিত হয়। তাঁরা হতাশ হয়ে দেখেন নতুনের দুর্বার অগ্রগতি ও জয়, প্রাচীনের অসহায় ক্রমবিলুপ্তি। কিন্তু অতীত স্মৃতির চর্বিতচর্বণ বা শোকগাথার বহ্বারম্ভা আসলে

প্রমাণ করে বিপ্লবের সাফল্য। যদি বিপ্লবের সাফল্য না আসতো, প্রাচীনপন্থীরা যদি সমাজটাকে কব্জা করে রাখতে পারতেন তবে তাঁদের ঐ শোকগাথা রচনা করার কোন প্রয়োজন হ'ত না।

চীনে কিন্তু এ দু-ধরনের সাহিত্যের কোনটাই নেই। না আছে অতীতের উদ্দেশে রচিত বিলাপমুখর গীতি, না আছে নবীনের আবাহন-সঙ্গীত। কারণটা কি? চীনে এখনও বিপ্লব সফলতা অর্জন করে নি। বর্তমানে চীনে যে অবস্থাটা চলছে তা যেন—শীতের ধানে দুধ আসেনি, গোলার ধান খেয়ে উজাড়,—অর্থাৎ কিনা এমন একটা অবস্থা যেখানে প্রথম পর্বটা শেষ, কিন্তু দ্বিতীয়টার দেখা নেই। সর্বত্র বিপ্লবী কাজের তোড়জোড়। প্রাচীন ভাবধারার অনুসরণে বিভিন্ন সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে চলেছে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এখন তার সোচ্চার আত্মপ্রকাশ। আমি মনে করি, বিপ্লব যে কোনরকমেই সমাজের ওপর গভীর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি, সেটা আর না বলাই ভাল। বিপ্লবী হাওয়া প্রাচীনপন্থীদের দেহ স্পর্শ করেনি। এজন্যই প্রাচীনপন্থীরা বাস্তব জগত থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারছেন। কোয়াঙ-তুঙের পত্রপত্রিকাগুলি সবই সাবেকী ঢঙের লেখা প্রকাশ করে। নতুন ঢঙের লেখা কচিৎ দেখা যায়। এটাই প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট যে সেখানে বিপ্লবের উত্তপ্ত হাওয়া গিয়ে পৌঁছয়নি। নতুনকে ঘিরে প্রশস্তি গীত নেই, অতীতকে নিয়ে বিলাপ গীতিরও অভাব। কোয়াঙ-তুঙ দশবছর আগের কোয়াঙতু-ঙই রয়ে গেল। শুধু যে এই তাই নয়। এমনকি তিক্ততা হেতু বিলাপ, আর্তনাদ ও অবিচারের বিরুদ্ধে চীৎকার চেঁচামেচি—এধরনের নিরীহ পদার্থের পর্যন্ত কোন চিহ্ন নেই। সরকারী অনুমতি পেয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলি সময় সময় মিছিলের আয়োজন করে, কিন্তু নিপীড়নের বিরুদ্ধে জেগে উঠে এই মিছিলে সামিল হয়েছে—এমন মনে করার কোন কারণ নেই। বরং এ যেন সরকারী আদেশে বিপ্লব। চীনের সমাজব্যবস্থায় কোন রূপান্তর সাধিত হয়নি তাই অতীতের জন্য শোকগাথাও নেই। আবার সম্পূর্ণ নতুন মনস্কতায় উদ্দীপিত কবিতা নাটকও নেই। একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়াতে এ দু-ধরনের সাহিত্যের দর্শন মেলে। তাদের দেশের প্রাচীনপন্থী লেখকেরা সবাই দলে দলে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন আর বিদেশে থেকে দুঃখ-আক্ষেপের রসে জারিত শোকগাথা গেয়ে চলেছেন। এদিকে নতুন সাহিত্য অনলস প্রচেষ্টায় ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। যদিও আহামরি তেমন কোন সৃষ্টি আজও হয়নি তবু নতুন সৃষ্টির সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তাদের কণ্ঠে ইতিমধ্যে গর্জনের পরিবর্তে প্রশস্তির মধুর সুর ধ্বনিত

হচ্ছে। বিপ্লবের জয়ের ফলে সমাজে যে প্রভাব পড়ে সাহিত্যে তাকে প্রশংসনীয় ভাবে কাজে লাগান হচ্ছে। এর পরে রথের চাকা কোন লয়ে ছুটবে তা এখনই অনুমান করা যায় না। তবে আমার ধারণা, বিপ্লবের সাফল্যে সৃষ্টি হবে জনগণের পৃথিবী আর তাই সেই অনাগত ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে গণসাহিত্য।

বর্তমানে যেমন মহাচীন, তেমন পৃথিবীর সর্বত্র গণসাহিত্যের অভাব বোধ হয়। পরিবর্তে কবিতা, গীতি এসবই সমাজের ওপরতলার সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হয়ে থাকে। তাঁরা ভরা পেটে পরম আনন্দে আরাম কেদারায় এলিয়ে পড়ে দুহাতে গল্প-কবিতার বই তুলে নিয়ে মগজস্থ করেন। লেখ্য বিষয়-বস্তুগুলো সবই এক সুরে বাঁধা। একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ও একজন সুন্দরী মহিলা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলেন, দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় সখ্যতা হ'ল। হঠাৎ একজন মূঢ় ব্যক্তির সোরগোল নিপাট সুন্দর পরিবেশে অশ্লীল মেজাজের সৃষ্টি করলেও অচিরে পুনর্মিলনের শুভরজনী এসে গেল তাদের জীবনে। দেখতে দেখতে মনে কেমন যেন এক আহ্লাদের সুড়সুড়ি লাগে। এগুলো দেখে ওপরতলার মানুষের মধ্যে মিষ্টিমিষ্টি আনন্দ অনুভূত হলেও নীচের তলার মানুষেরা হেসে লুটোপুটি খায়। কবছর আগে 'নওজোয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটা গল্পে দেখান হয় কিভাবে কয়েকজন অপরাধী হিম-মণ্ডলে নিদারুণ জীবন যাপন করছে। বিদগ্ধ অধ্যাপকগণ এতে ভীষণ রুষ্ট হন। তাঁরা ঐ ছোটলোকেদের জীবন মোটেই দেখতে চান না। রিক্সাচালককে নিয়ে কবিতা, সে-তো অন্ত্যজ শ্রেণীর কথা বলে! তেমনি আবার কোন নাটকে অপরাধের দৃশ্য দেখান হলেই তা নীচু-মানের নাটক বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু ভদ্রলোকদের নাটকে কেবল শিক্ষিত ব্যক্তি আর সুন্দরী রমণীদের নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় পাওয়া যায়। আবার তাই নয়। পণ্ডিতদের মাঝে থাকেন পণ্ডিত-চূড়ামণি। সুন্দরী রমণীরা বৃত্ত রচনা করে আছেন সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে ঘিরে। নায়ক-নায়িকাদের মুখে-চোখে কেমন আনন্দ-আহ্লাদের মাখো মাখো ভাব, দেখে তাঁদের চোখ জুড়োয়। আর ছোটলোকদের তো করার কিছুই নেই তাই বরঞ্চ তারা ভদ্রলোকদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'বেশ ভালো, বেশ ভালো' রব তুলুক! বর্তমানে কিছু ব্যক্তির মধ্যে সাধারণ মানুষকে নিয়ে গল্প-কবিতা লেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাঁরা এগুলোকে জনগণের সাহিত্য লেবেল এঁটে বাজারে ছাড়ছেন। যদিও মোটেই তা নয়। কারণ জনগণ তো এখনও মুখই খোলেনি, তবে কিভাবে তাঁরা তাদের মনের কথা বলতে পারে? আসলে ঐ লেখকেরা

আড়াল থেকে বা তফাতে থেকে জনগণের জীবনযাত্রাকে লক্ষ্য করেন এবং নিজেদের লেখায় তাদের এক একটা স্থান করে দিয়ে তাদের মুখ দিয়ে নিজেদের কথা বলেন। সন্দেহ নেই যে বর্তমানে বেশ কিছু সাহিত্যিক আছেন যাঁরা দরিদ্র। তবে আশপাশের শ্রমিক-কৃষকের তুলনায় তাঁদের অবস্থা অনেক স্বচ্ছল। তাঁদের পকেটে সামান্য হলেও কিছু পয়সা থাকে যা দিয়ে তাঁরা বই-কাগজ কিনতে পারেন। যখন অবসর পান সেগুলো পড়তে পারেন। প্রয়োজনে কিছু লেখার কাজও করতে পারেন। আর লেখাগুলো পড়ে মনে হয় তা যেন জনগণের কথা বলছে। আসলে কিন্তু তা নয়। লোকগীতি, পালা, নাটকের মধ্যে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। তাই সেগুলোর পুনর্লিখনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে চিত্রিত করা হচ্ছে বলে দাবী তোলা হয়। যাঁরা এ দাবী তোলেন তাঁদের মধ্যে প্রাচীন ধারার প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। গ্রামাঞ্চলের অনেক বিঘে জমির মালিক সম্পন্ন ভদ্রশ্রেণীর প্রতি তাঁরা বিশেষ অনুগত। প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ ভদ্রলোক জমিদার শ্রেণীর চিন্তাভাবনাকে নিজেদের চিন্তাভাবনা করে তোলেন। এই শ্রেণীভুক্ত মানুষেরা যে ছন্দরীতির অনুসারে কবিতা লেখেন তাঁরা সেগুলোকেই অনুকরণ করেন। এই লেখাগুলোতে যে ভাবনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তা সবই পচাগলা জীর্ণ-দীর্ণ অপদার্থ বস্তু। এগুলো দিয়ে জনগণের জন্য নয়া-সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। বর্তমানে চীনের কবিতা গল্প অন্যান্য দেশের সাহিত্যের ওপর টেক্কা মারার ক্ষমতা না রাখে তো কি আসে যায়? এগুলো সাহিত্য তো বটে! বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছি এ কথা ঘোষণা করাতো কোন ছার, গণ-সাহিত্য সুরু করতে পেরেছি এমন সদম্ভ উক্তিও করতে পারি না। বর্তমানে লেখকেরা অনেকেই বিদ্বান। তাই বিদ্বানের মত কাজ হবে যদি তাঁরা শ্রমিক কৃষকের চিন্তাভাবনাকে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা করে তোলেন। শ্রমিক-কৃষক যখন বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তি অর্জন করবেন তখনই তাঁরা পারবেন শ্রমিক-কৃষকের চিন্তাভাবনাকে নিয়ে সত্যিকারের গণসাহিত্য রচনা করতে। যাঁরা দাবী করেন যে চীনে ইতিমধ্যেই গণসাহিত্য জন্মগ্রহণ করেছে তাঁরা আসলে অন্যায় দাবী করেন।

যাঁরাই বাস্তবজীবনে সংগ্রামে লিপ্ত তাঁরাই বিপ্লবী যোদ্ধা। তাঁদের উচিত বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করা। সাহিত্যচর্চা বর্তমানে স্থগিত রাখাই ভাল। প্রকৃত যুদ্ধের কালে সাহিত্য পাঠ থেকে কোন উপকার হয় না। সব থেকে ভাল হয় যদি সুন্দর ভাষায় একটি চমৎকার সমরসঙ্গীত রচনা করা যায়। তাহলে

যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে অবসর কালে সেটি পাঠ করে মনে অশেষ তৃপ্তি পাওয়া যায়। একটা উপমা দিয়ে দিই। একটা উইলো গাছ রোপণ করা হ'ল। ধীরে ধীরে গাছটি বড় হয়ে ডালপালা মেলে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে দিল নিজেকে। নীচের শীতল ছায়ায় দুপুরে চাষী ক্লান্ত অবসন্ন দেহে আশ্রয় নিল, পেটে দুমুঠো দিয়ে বিশ্রামের কোলে নিজেকে সঁপে দিল। চীনে বর্তমানে প্রকৃতপক্ষে দিকে দিকে তুমুল বিপ্লবী লড়াই চলছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা কবিতা মারমুখী শাসকদের সন্ত্রস্ত করে না, বরং একটা বোমার বিস্ফোরণে তারা ল্যাজ গুটিয়ে পালায়। কিছু ব্যক্তি দাবী করেন যে বিপ্লব চালনা করার প্রচণ্ড শক্তি নিহিত আছে সাহিত্যে। কিন্তু আমি তাতে সন্দেহ প্রকাশ না করে পারি না। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম পরিশ্রম। পরিশ্রমের পর অবসরের সময়ে সৃষ্টি হয় সাহিত্য। তবে এটাও ঠিক যে সেই সাহিত্যই একটি জাতির সভ্যতা সংস্কৃতিকে তুলে ধরে।

সম্ভবত মানুষ কখনও আপন কর্তব্য সম্পন্ন করে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তাই আজ এখানে আমার বক্তৃতা শুনতে এসেছেন এমন সব ব্যক্তি যাঁদের আঙুল সর্বদা বন্দুকের ট্রিগার নাড়াচাড়া করছে। অথচ মজার কথা আমি নিজেই নিজের লেখাগুলোর ওপর বীতশ্রদ্ধ। আমি না, নিজেই গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে ভালবাসি এবং মনে মনে চাই যেন গোলাগুলির আওয়াজ সাহিত্যের আওয়াজকে অনেকগুণ ছাপিয়ে ওঠে।

লেখক ও জীবন

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ইলিয়া এরেনবুর্গ

প্রত্যেক লেখকেরই তার নিজস্ব একটা লেখার ধরন আছে; তার কোন বাঁধা-ধরা ফরমূলা নেই। কোন একজন তরুণ লেখককে বিশেষ একটা রীতি অনুসরণ করতে বলা বিপজ্জনক; কারণ তার ফলে আপনি তাকে লিখতে শেখাবেন না, অনুকরণ করতে শেখাবেন। সুতরাং, যতগুলি লেখক ততগুলি লেখার রীতি এ-কথা সর্বদা মনে রেখে এই বক্তব্যগুলিকে আমি আপনাদের বিশেষ একজন সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসাবেই গ্রহণ করতে বলব।

প্রথমেই আমি আপনাদের একটা উপন্যাসের জন্মকথা শোনাব। আর প্রসঙ্গে উল্লেখ করব 'ঝড়'-এর কথা, কারণ, নিজস্ব অভিজ্ঞতার মারফৎ অনেক জিনিসই বোঝানো সহজসাধ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমি 'ঝড়'-এর কথা ভাবতে শুরু করি। সে সময়ে আমি লেখায় হাত দিইনি, দেওয়া সম্ভবও ছিল না; আমি অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আমার জীবনে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল ১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মকালে; আর ১৯৪৫-এর ৯ই মে যখন সবার জীবনেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল, আমার জীবনেও আমি তার পরিসমাপ্তি কামনা করলাম। আমি জানতাম আমি যদি তখন 'ঝড়' লেখা শুরু করি তাহলে যুদ্ধ আমার আপিসে, আমার ডেস্কে, আমার চেতনায় ও আমার হৃদয়ে জাগরূক হয়ে থাকবে। আমি নিজেকে এই বলে বোঝাতে চাইতাম যে সাধারণ সৈনিক আর তরুণ যুবকেরা যারা ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে সোজা যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছিল তারাই তো যুদ্ধের উপন্যাস লিখছে (এখানে আরও বলা দরকার—আমার নিশ্চিত ধারণা যে যুদ্ধ নিয়ে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

আজও রচিত হয়নি ; তারাই এই উপন্যাস রচনা করছে বা করবে যাদের যুদ্ধ সম্পর্কে প্রচণ্ড ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা আছে)। আমি 'ঝড়' লিখতে চাইনি, তবু আমি লিখেছি। কেন? কারণ আমার মনে হয়েছিল যে মৃতদের কথাও সাধারণ্যে প্রচারিত হবার অধিকার আছে। আমার আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জন যারা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেনি আমি তাদের কথা বহুবার ভেবেছি ; আর যুদ্ধের ময়দানে শোনা গল্প ও স্বীকারোক্তির কথা ভেবে নিজেকে বলেছি, তারা যে কি ভাবে জীবন যাপন করেছিল, সংগ্রাম করেছিল আর মৃত্যুবরণ করেছিল সে কথা তো আর তারা কোনদিন প্রকাশ করতে পারবে না। এই ভেবে আমি লেখায় হাত দিই। নিজের স্মৃতির হাত থেকে পালাবার উপায় আমার ছিল না ; যা আমি আমার কর্তব্য বলে জ্ঞান করেছি তার থেকেও নিষ্কৃতি ছিল না আমার।

হতে পারে 'ঝড়' বই হিসাবে সার্থক নয় ; কিন্তু বইখানি লিখে আমি অনুতপ্ত নই। আসলে, ও বই না লিখে আমি পারতাম না।

কি করে একজন ভাল লিখতে পারে—লিওনিভ আন্দ্রেয়েভের এই প্রশ্নের জবাবে টলস্টয় বলেছিলেন : "আপনি যদি একটা বই লিখব ভেবে থাকেন অথচ কি ভাবে লিখবেন ভেবে না পান তাহলে লিখবেন না।" আমি কথাগুলিকে অর্থপূর্ণ মনে করি, আর যে পাঠক অমুক লেখক এই রকম বা ঐ রকম উপন্যাস লেখেন না বলে অভিযোগ করেন তার কথা বুঝে উঠতে পারি না। "এই উপন্যাস যখন আপনার না লিখলেও চলত তখন আপনি এটি লিখলেন কেন? তাতে আপনার এবং পাঠক হিসাবে আমারও উপকার হত" পাঠকটি ঐ লেখককে এই প্রশ্নটি করলে ভালো করতেন নাকি? অন্তরের সাড়া না পেলে প্রেরণাদায়ক বই লেখা কখনই সম্ভব নয়। সে রকম বইয়ে বুদ্ধির ছাপ থাকতে পারে কিন্তু প্রাণস্পন্দন থাকবে না আর তা পড়ে পাঠকরাও অনুপ্রাণিত হবেন না। কেবল বুদ্ধির সাহায্যে একটা উপন্যাস সৃষ্টি করা অসম্ভব ; প্রথমতঃ তা লেখকদের জীবনজাত হওয়া চাই।

অনেক সময় বলা হয় যে লেখকের 'নিরীক্ষণ শক্তি' থাকা চাই-ই। এ কথা অনস্বীকার্য কিন্তু শিল্পীর 'নিরীক্ষণ শক্তি'র উৎস কোথায়? সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফার কখনই এক মুহূর্তের জন্যও বিখ্যাত ব্যক্তিদের দৃষ্টিছাড়া করতে চান না, সর্বদাই হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য আর ব্যঞ্জনাময় ভাবভঙ্গির খোঁজে ঘুরে বেড়ান ও অবিরাম লাইকা ক্যামেরায় ছবি তোলেন। তিনি নিরীক্ষণ করেন, এ কথা কেউই অস্বীকার করবে না। রেমব্রাঁ যাদের ছবি আঁকতেন তাদের অধিকাংশকেই তিনি

খুব বাইরে থেকে জানতেন—অথচ তাঁর ছবিগুলিতে তিনি তাঁর মডেলের আত্মাকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারতেন। আর আজও তাঁর ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে আমরা গভীর ভাবে অভিভূত হই। ক্যামেরা যে কোন লোক বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুলতে পারে কিন্তু শিল্পী তাঁর মডেল নির্বাচনেই সীমাবদ্ধ; তাঁর নিরীক্ষণ শক্তি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও মনের প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

কতকগুলি মাল-মশলা আছে যা দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ ও তার চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করা যায়; আবার অন্য মাল-মশলার সে ক্ষমতা নেই। কেউ কেউ বলবেন যে ভাবাবেগ, সুখ, দুঃখ নামক বিশেষ গুণগুলি সৃষ্টি করার ক্ষমতা লেখকের মধ্যে বর্তমান। কিন্তু একই রকম গুণ প্রত্যেকের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। লেখক একই রকম লোকদের মধ্যে বিচরণ করেও অনেক সময়ে এমন কি তাদের নিয়ে মাথাও ঘামান না; কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষের ভাগ্য, জয়-পরাজয়, উত্থান-পতনের মধ্যে তিনি বছরের পর বছর বসবাস করেন।

লেখকের এই বিশেষ গুণগুলি বুঝতে হলে পাঠকদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই যথেষ্ট। কারণ পড়াটাও একটা সৃষ্টিকর্ম আর পাঠক ক্রমাগতই উপন্যাস পড়ছেন। 'ঝড়'-এর পাঠকদের এক সভার কথা আমার মনে আছে। তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা আগাম সমালোচনাগুলি পড়ে নিয়েছিল। পেশাদার সমালোচকদের অনুকরণ করতে গিয়ে তারা উপন্যাস সম্পর্কে যত না বলল তার চেয়েও বেশী বলল উপন্যাসের সমলোচনা সম্পর্কে। সভার শেষে জোরালো আলোচনা শুরু হল। দুটি মেয়ের মধ্যে মতভেদ ঘটল উপন্যাসের নায়ককে নিয়ে। একজন বলল, "সার্জির মত লোকের সঙ্গে বাস্তব জীবনে দেখা করতে আমার ভীষণ ইচ্ছা করে!" অন্যজন উত্তর দিল, "আমি বুঝি না ওর মধ্যে কি পেয়েছ। ওটা একটা ব্যক্তিত্বহীন অপদার্থ লোক!" তারা দুজনেই সমবয়সী, দুজনে একই শিক্ষা পেয়েছে আর দুজনারই প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের কল্পনাশক্তি, হৃদয়াবেগজনিত অভিজ্ঞতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপন্যাসখানি পড়েছে। আর এই ভাবে জন্ম হয়েছে দুটি বিপরীত সার্জির।

মনে করুন ঐ দুজন সাহিত্যিক এই দুটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। তারা কেউই এই দুই প্রবাহকে উপলব্ধি করতে পারেন কিনা সন্দেহ। লেখকের তাঁর নিজস্ব চরিত্র, অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তি আছে যা দিয়ে তিনি তার নায়ককে বাছাই করেন। ঘটনা, চরিত্র ও দ্বন্দ্বকে চিত্রিত করার মূল্যায়নাটাই লেখকের

নিরীক্ষণ শক্তি নয়, ওটা তার চরিত্র চিত্রণের শক্তি। সাধারণতঃ যখন বলা হয় যে একজন লেখক লিখতে শিখছেন, তখন এই কথাই বোঝায় যে তিনি সাহিত্যিক শিক্ষানবিসী করছেন। লিখতে শেখা কঠিন কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু লেখক না হয়েও একজন ভালো লিখতে পারেন। কেবল লিখবার টেবিলেই সাহিত্যকার সৃষ্টি হয় না, সাহিত্যকার সৃষ্টি হয় জীবনের পাত্রে। কারণ হৃদয়াবেগ বর্ণিত হবার আগেই তা সূচিত হওয়া প্রয়োজন। সত্যি কথা, ভ্রমণ প্রত্যেককে যেমন সাহায্য করে লেখককেও তেমনি সাহায্য করে। একজন লেখক যিনি উপন্যাস লিখছেন বা লিখবেন তাঁর পক্ষে দৈনন্দিন জীবনের বা তিনি যে গল্প বলতে চান তার কাঠামো বা পৃষ্ঠপটের কোন কোন বিবরণ যাচাই করার উদ্দেশ্যে দূরের শহর, কারখানা বা গ্রাম দেখতে যাওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই থেকে তাঁর লেখনীতে উপন্যাস প্রবাহিত হবে বা এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে আপনি বই লেখার ধারণা অর্জন করতে পারবেন—এটা আশা করা নেহাতই মূঢ়তা। আপনি বনে বেড়াতে গিয়ে ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে আনতে পারেন। কিন্তু মানুষের ভাবাবেগকে কুড়িয়ে আনার জন্য ভ্রমণে বের হওয়ার কথা কল্পনা করাটাই পীড়াদায়ক। নায়ককে বাছাই করতে হলে কেবল তার সঙ্গে দেখা হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, তাকে বুঝতে হবে আর এই বোঝার কাজটা লেখকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত। নিশ্চয়ই, একজন লেখক যা কিছু লেখেন বা তাঁর নায়কেরা যে-ভাবে জীবনযাপন করেছেন ও করছেন, সবটাই তাঁর জীবনজাত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার কিছুটা তাঁর জীবনলব্ধ হওয়া চাই-ই বা তাকে তাঁর নায়কদের জীবনের পুরো হদিশ দিতে পারবে। অন্যের হৃদয়ের চাবিকাঠি তার হাতে থাকা চাই। কোন কোন সাহিত্যিকের হাতে এমনি অনেকগুলি চাবিকাঠি আছে, আবার অন্যান্য সাহিত্যিকদের হাতে এমনি চাবিকাঠির সংখ্যা অল্প কিন্তু এমন সাহিত্যিক কেউ নেই আর থাকতেও পারেন না, তিনি যত বড় দরের সাহিত্যিকই হোন না কেন, যাঁর হাতে সবকটা চাবিকাঠি থাকা সম্ভব।

কেউ কেউ আপত্তি তুলে বলবেন: "'যুদ্ধ ও শান্তি'-তে বর্ণিত ঘটনাগুলি যখন ঘটেছে টলস্টয় তখন জন্মাননি।" যুক্তিটা বিশ্বাসজনক ঠিকই কিন্তু তা বাহ্যতঃ সত্য। আমার মতে, ১৮১২ সালের যুদ্ধের বর্ণনা কখনই অত শক্তিশালী হত না যদি না, টলস্টয় সেবাস্তপোলে গোলন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষ হতেন। কোন কোন লোক বলবেন, তা বটে, কিন্তু দুটো যুদ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি মানছি—ও দুটি

ভিন্ন যুদ্ধ—চরিত্রগত ও কৌশলগত দু-রকম বিচারেই। কিন্তু টলস্টয় জেনেছিলেন আতঙ্ক, বীরত্ব, মৃত্যুর দৈনন্দিন উপস্থিতি আর যুদ্ধ কি জিনিস এবং তারই ফলে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরেছিলেন।

একজন লেখক তাঁর নোট বই নিয়ে সামরিক হেডকোয়ার্টাসে গিয়ে হাজির, তিনি জানতে চান আতঙ্ক-জয় কি জিনিস। কাজেই তিনি জনৈক সৈনিককে—যে গতকাল এক বন্দীকে সঙ্গে করে এনেছিল—ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। সেই সৈনিকটি তাঁকে কি কি ঘটেছিল বলতে লাগল (বা সামরিক সংবাদপত্রে খবরটা কিভাবে বেরিয়েছিল তাই হুবহু বলল)। যদি সৈনিকটি তার ট্রেঞ্চ থেকে উঠে আসার মুহূর্ত থেকে শুরু করে সৈন্যাধ্যক্ষ কর্তৃক তার প্রশংসিত হওয়ার সময় পর্যন্ত যা যা ঘটেছিল তা তার মগজে ও হৃদয়ে নতুন করে সৃষ্টি করতে পারত; সে নিজেই প্রায় আধা লেখক হয়ে উঠত। সৈনিকটির অস্পষ্ট ছাড়া-ছাড়া উক্তির সাহায্যে তার আভ্যন্তরিক জগতকে পুনর্নির্মাণ করার কাজটা সহজসাধ্য ও কঠিন দুই-ই, তার জন্য লেখকের হাতে চাবিকাঠি থাকা দরকার। এবার আরও ব্যক্তিগত একটা উদাহরণ দিই। একদিন এক তরুণ লেখক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমার তখন মাথা ধরেছে, তাই এ্যাসপিরিন বড়ি খুঁজছিলাম। বড়িটি গলাধঃকরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই যুবকটি প্রশ্ন করল "মাথাধরা ছেড়েছে?" চলে যাবার সময়ে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, "বলতে পারেন, মাথা ধরলে কষ্ট হয় কিনা?" আসলে ওর কোনদিন মাথা ধরেনি। ওর ভাগ্য ভালো নিশ্চয়ই, বাস্তবিক আমিও সেজন্য ঈর্ষা বোধ করছিলাম। ধরুন ঐ মাথায়—যে মাথা কোনদিন 'মাথাব্যথা' বলে কোন জিনিস জানেনি—মাথাব্যথার কথা লেখার এক আজগুবী ইচ্ছা জাগল। ফলে, হয় সে অন্য লেখকের লেখা থেকে কয়েক লাইন চুরি করল নয় তো এমন উদ্ভট সব কথা লিখল যা পড়ে পাঠক বিরক্ত হল বা হেসে উঠল।

অবশ্য আসল কথাটা ঐ ছেলেটি বা মাথাব্যথাকে নিয়ে নয়। আসল কথা হল ঐ হাসি বা বিরক্তি যা লেখককে কাল্পনিক চিন্তা বা ভাবাবেগ বর্ণনা করতে দেখলে পাঠককে পেয়ে বসে। যে জগৎ লেখকের নিজের কাছেই অজ্ঞেয় তার কথা লিখতে যাওয়া লেখকের অন্যায়। আমাদের কিছু সমালোচক আছেন যাঁরা এই লেখক বা ঐ লেখকের বইয়ের মধ্যে যা যা নেই তার সমালোচনা করেন: বইয়ে কি কি নেই তার একটা বিচিত্র তালিকা তৈরি করে নেন। আপনারা

এইসব লেখা পড়ে ভাবেন যে সাহিত্যিকরা বিশেষ করে অন্যমনা আর দায়িত্ব-জ্ঞানহীন জাতের মানুষ, তারা কেবল চশমা আর পাইপ নিতেই ভোলে না, সাহিত্য রচনায় সময়ে জরুরী বিষয় লিখতেও ভুলে যায়! কিন্তু লেখকের উদ্দাম কল্পনারও যেমন অবকাশ নেই তেমনি তার অভিজ্ঞতারও সীমাবদ্ধতা আছে। যখন লেখক সহৃদয় সমালোচকদের কথামত এমন বিষয় লিখতে বসেন যা তাঁর নিজের কাছেই বিচিত্র ও দুর্বোধ্য, তার ফল দাঁড়ায় এই যে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসেও এমন কতকগুলি পৃষ্ঠা থেকে যায় যা হাতড়াতে গিয়ে পাঠকেরা বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন, "এই পাতাগুলি একেবারেই কাজের নয়।"

আজকাল একথা প্রমাণ করার কোনই প্রয়োজন নেই যে, যে লেখক নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন, বন্ধ্যাত্ব ও মৃত্যুই তাঁর পরিণাম। প্রত্যেক সোভিয়েত নাগরিক একথা জানে। একজন ফরাসী সমালোচক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে মরুদ্বীপে বসেও লেখক সাহিত্য রচনা করতে পারেন আর উদাহরণ হিসাবে তিনি মার্শেল প্রুস্ত-এর নাম করেছেন, যিনি নিজেকে নিশ্ছিদ্র ঘরে আবদ্ধ করে একটি বইয়ের সমস্ত কটা পর্ব লিখেছিলেন। কিন্তু সে ঘরে আবদ্ধ হওয়ার আগে মার্শেল প্রুস্ত সমাজে বাস করতেন আর সে কারণেই তিনি কিছু লিখতে পেরেছিলেন।

সমাজের সঙ্গে লেখকের সংযোগ কখনই নিষ্ক্রিয় হতে পারে না। জীবনকে নিরীক্ষণ করাটাই যথেষ্ট নয়, তাকে তার অংশীদার হতে হবে। একজন তরুণ লেখকের পক্ষে অপরিণত অবস্থায় সাহিত্যিক পারদর্শিতা অর্জনের চেষ্টার চেয়ে—যা তাকে তার সমবয়সী মানুষ ও তাদের দৈনন্দিন কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়—তার চেয়ে বেশী বিপজ্জনক আর কিছু নেই। মনে করে দেখুন ম্যাকসিম গোর্কী কত দীর্ঘদিন স্কুলে—জীবনের 'বিশ্ববিদ্যালয়ে' কাটিয়েছেন, মনে করুন শেকভ তাঁর চিকিৎসক জীবন থেকে কত অভিজ্ঞতা আহরণ করেছেন। বিস্মিত হবার কিছু নেই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যথা 'স্তালিনগ্রাদের পরিখায়' বা 'তারকা' লিখেছেন তাঁরাই যাঁরা যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছিলেন দর্শক হয়ে নয়, যোদ্ধা হয়ে।

আগেকার আমলে, দেশের সমস্ত জনসংখ্যার কথা বাদ দিন, বহুসংখ্যক লোকই রাশিয়ার সাহিত্যে মাথা ঘামাত না। দেশের লোকে ভালো সাহিত্যিকদের নাম পর্যন্ত জানত না কিন্তু অন্যদিকে সেই সব সাহিত্যিকেরা জনসাধারণের জীবনকে ভালভাবে জানতেন। কারণ, ত্রিশ, এমনকি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাঁদের সাহিত্যিক

পেশা ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত কিছু করে জীবিকা নির্বাহ করতে হত। প্রত্যেকটি সাহিত্যিককেই নানা রকম পেশা গ্রহণ করতে হয়েছে। আমাদের পাঠকরা আমাদের সাহিত্যিকদের ভালভাবেই জানেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়,—নিঃসংকোচে স্বীকার করা ভালো যে, আমাদের সব সাহিত্যিকরা পাঠকদের বাস্তব জীবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। আমাকে কখনো কখনো প্রশ্ন করা হয়, "আপনি মাদোর চরিত্রে কাকে আদর্শ হিসাবে নিয়েছেন," বা "বাস্তব জীবনে সাজি ভ্লখাভ-এর নাম কি?" কিছু পাঠকের ধারণা যে লেখক যেন নায়কের খোঁজে ঘুরে বেড়ান আর তাকে পেলেই স্বনামে বা নতুন নামে বইয়ে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু উপন্যাসের নায়ক লেখকের মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। নায়ক হলেন অনেক কিছুর মিশ্রণ। মাদো-কে সৃষ্টি করার জন্যে আপনাকে একটি বা একশোটি মেয়েকে লক্ষ্য করার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু সেইটাই সব নয়; লেখককে তাঁর নিজস্ব কিছুও এই মিশ্রণে যোগ করতে হবে।

লেখকের চোখের সঙ্গে অনুবীক্ষণের তুলনা করা চলতে পারে; তা গভীরে তলিয়ে যায় আর লেখককে মানুষের সমস্ত কিছু নিরীক্ষণ করতে সাহায্য করে। সঙ্গে সঙ্গে এই 'আলোকপাত' সত্ত্বেও, নায়কের আভ্যন্তরিক জগতের একটা অংশ আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। নিজের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে লেখক অনেক কিছু অনুমান করে নেন ও নায়কের মধ্যে কিছুটা পরিমাণে নিজের হৃদয়াবেগ উৎসারিত করেন।

কয়েকজন পণ্ডিতের ধারণা যে একজন তরুণীর আত্মহত্যার সংবাদ পড়েই টলস্টয়ের মাথায় 'অ্যানা ক্যারেনিনা' লিখবার পরিকল্পনা জাগে। তা হতে পারে কিন্তু এই দিয়ে নায়িকার বাস্তবতা ও গভীরতাকে বোঝানো যায় না। 'অ্যানা ক্যারেনিনা'-য় যা আমাদের অভিভূত করে তা হল ভালবাসার রূপায়ণ, এবং অনেক পাঠিকাই মনে মনে ভাবেন কী করে টলস্টয় নারী-হৃদয়ের জ্বালাকে এমনিভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন। সত্যি কথা বলতে কি, টলস্টয় মানব-হৃদয়ের মধ্যে দৃষ্টিপাত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আপনি যখন টলস্টয়ের পত্রাবলী ও ডায়েরিগুলি পড়েন, আপনি বুঝতে পারেন অ্যানার ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্বয়ং ঔপন্যাসিকের অনেক হৃদয়াবেগজনিত অভিজ্ঞতাই জড়িয়ে আছে। হয়তো এই কারণেই অ্যানার ভাগ্য আজও বহু পাঠিকাকে উদ্দীপিত করে; হৃদয়াবেগের শক্তি ও তেজস্বিতা মানুষকে পুরনো দিনের বিশ্বাস ভুলিয়ে দেয়।

গত বছর আমি একটি ফরাসী প্রবন্ধ পড়ি। প্রবন্ধটি এমন একজন ব্যক্তিকে

নিয়ে যিনি নাকি মাদাম বোভারীর মডেল ছিলেন। রু এঁ-র পুরনো নথিপত্রের দপ্তরখানা ঘেঁটে আর সেখানকার বনেদী বাসিন্দাদের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে গবেষকরা একটি মহিলাকে খুঁজে পেয়েছেন যিনি নাকি ফ্লবেয়ারের মডেল ছিলেন। প্রবন্ধটি পড়ে আমার হাসি পেয়েছিল, কারণ তাঁর বন্ধুকে লেখা ফ্লবেয়ারের এক চিঠির কথা আমার মনে ছিল যাতে তিনি তাঁর সন্থ-আরম্ভ করা উপন্যাস সম্পর্কে বলছেন, "আমিই এমা"। গোড়াতে এই রকম উক্তি বিস্ময়কর ঠেকতে পারে। একদিকে আমরা বয়স্ক, ব্যস্ত-সমস্ত, অবিবাহিত এক পুরুষকে দেখতে পাচ্ছি যাঁর অতি সাবধানী উক্তিতে টুর্গেনিভ-এর মত কঠিন ব্যক্তি পর্যন্ত গভীরভাবে মনযোগ দিচ্ছেন, অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ, প্রেমে পড়তে উন্মত্ত, প্রায় নীচু স্তরের এক গ্রাম্য তরুণীকে। আপনারা ভাবতে পারেন এই দুয়ের মধ্যে কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু ফ্লবেয়ার চিঠিতে মিথ্যা কথা বলেননি, তিনি স্বীকারোক্তি করেছিলেন মাত্র। আমরা যদি তাঁর জীবনী, জীবন থেকে তাঁর আত্মরক্ষার অক্ষমতা, তাঁর চিত্রিত 'সুন্দর'-এর মুখে বিস্ময়ের প্রকাশ, দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ে তাঁর সংকটের কথা মনে করি তাহলে বুঝতে পারব যে এমাকে তাঁর নিজের অনেকখানি তিনি অর্পণ করেছেন আর তারই ফলে বেচারী মাদাম বোভারী কেবল তার স্বামীকে, ওষুধ-বিক্রেতাকে আর তার প্রেমাস্পদদেরই নয়, 'সালামবোর'-র গ্রন্থকারকেও রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে।

কোন কোন লেখক বই লিখবার আগে বিস্তারিত পরিকল্পনা ছকে এঁকে নেন। আবার কেউ কেউ কি লিখবেন তার সামান্যতম পরিকল্পনা না করেই লিখতে বসেন। আলেক্সি টলস্টয় একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর এক বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা আগে পর্যন্ত তিনি জানতেনই না তাঁর নায়কের ভাগ্যে কি ঘটবে। ভাস্কর মাটির তাল নিয়ে যেমন মূর্তি গড়ে তিনি সেইভাবে উপন্যাস লেখেন: মাটির তাল ধীরে ধীরে মুখাকৃতিতে পরিণত হয়। অন্যান্য লেখকেরা অনেকটা রাজমিস্ত্রির মত—রুল আর কম্পাস নিয়ে বসেন কিন্তু এঁদের নায়কেরাও একশো এমন কি দুশো পৃষ্ঠা লেখা না হবার আগে পুরো আকৃতি পায় না। অনিবার্যভাবেই তাঁদের পরিকল্পনায় পরিবর্তন ঘটে যখন নায়ক জীবন্ত হয়ে লেখকের প্রাথমিক চিন্তাধারাকে বাধা দিতে অবতীর্ণ হয়। আপনাদের কাছে স্বীকার করা দরকার যে, আমি যখন 'ঝড়' লিখতে শুরু করি তখন সার্জি ও মাদো-র ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ অন্যরকম ছকে এঁকেছিলাম আর তাদের চরিত্রও ধোঁয়াটে অবস্থায় ছিল। রক্ত-মাংসের মানুষে পরিণত হবার পর নায়ক কখনো কখনো সম্পূর্ণ বিপরীত পথে

যায়—অস্পষ্ট ছায়া থাকাকালীন অবস্থায় ঔপন্যাসিক তাকে যেভাবে কল্পনা করেছিলেন সেভাবে না গিয়ে।

নায়করা অপরাধ করলে মাঝে মাঝে লেখকের সমালোচনা করা হয়। কিন্তু লেখক, যাঁর হয়তো তাঁর নায়কদের চেয়ে অনেক বেশী অন্তর্দৃষ্টি, অনেক বেশী কাণ্ডজ্ঞান আর অনেক বেশী বুদ্ধি আছে, তিনি তাঁর যুক্তি ও নীতিবিদ্যা নায়কদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন না; তাহলে সমস্ত শক্তি ও দুর্বলতাসমন্বিত রক্ত-মাংসের গল্পের বদলে আপনারা রক্তহীন নক্‌শা পাবেন মাত্র।

আমাদের মতে লেখক তাঁর নায়কদের প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন না। একজন মৃত্যুমুখী মানুষের চিত্র আঁকতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের মৃত্যুকেও উপলব্ধি করতে হবে। একদিন এক বন্ধু বালজাকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন লেখক তাঁর আরাম কেদারায় পড়ে আছেন—নাড়ীর অবস্থা দুর্বল ও অনিয়মিত। বন্ধুটি চিৎকার করে উঠলেন, "শিগগির, একজন ডাক্তার ডাক! মঁশিয়ে বালজাকের শেষ অবস্থা।" চিৎকার শুনে বালজাক জেগে উঠে বললেন, "তুমি বুঝতে পারনি। এইমাত্র ফাদার গোরিওর মৃত্যু হয়েছে।"

'ঝড়'-এর নায়ক সার্জির মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ হয়ে অনেক পাঠক আমাকে চিঠি দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যের চেয়ে সৌভাগ্যের চিত্র আঁকা একজন লেখকের পক্ষে অত্যন্ত সুখজনক। মাঝে মাঝে ডিকেন্‌স্-এর ওপর আমার ঈর্ষা হয়। তাঁর বইগুলিতে দেখবেন লোকে কষ্ট পাচ্ছে, স্বামী স্ত্রীদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তরুণ দম্পতিরা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা বাপ-মাদের ত্যাগ করছে। গল্পের শেষে পৃথিবীর পুনরাবর্তন ঘটছে, প্রত্যেকে বাড়ির টেবিলের চারধারে জড়ো হচ্ছে আর মহানন্দে কোমল আলোয় অবগাহন করে তার জীবনের ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করছে। মনে মনে আমি কল্পনা করি যে, 'ডেভিড কপারফিল্‌ড্' বা 'অলিভার টুইস্ট' লেখা শেষ করে ডিকেন্‌স্ পদচারণা করছেন: সুখী মানুষেরা চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে আর নায়কদের সৌভাগ্যে গ্রন্থকারের চিত্ত উদ্দীপিত। সার্জির ভাগ্যে ফিরে আসা যাক। যুদ্ধজয়ের পর আমাদের দেশে এমন একটিও পারিবারিক টেবিল খুঁজে বের করা দুষ্কর ছিল যেখানে অন্ততঃ একটি আসন শূন্য পড়ে না আছে। আমরা জানি পৃথিবীকে ফাশিস্ত বর্বরতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমাদের কী মূল্য দিতে হয়েছে; আমাদের শহীদদের কবর আমাদের দুঃখিত করে না, অনুপ্রাণিত করে।

ডিকেন্‌স্-এর উপন্যাসের মিলনান্তের কথা ভেবে দেখুন। নায়করা যখন

সানন্দে পারিবারিক টেবিলের ধারে জড়ো হচ্ছে, পাশের বাড়ীতে তখন নির্যাতিত হচ্ছে ছেলে-মেয়েরা, ঋণের বন্দীশালায় আর্তনাদ করছে হতভাগ্যেরা আর তরুণীদের অবমাননার অন্ত নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য যখন অপরিবর্তিত—কেবল ডিকেন্‌স্‌-এর নায়কদের আনন্দ উল্লাসই তখন লটারির একমাত্র বিজয়ী টিকিট। এই হল সে সময়কার ও সমাজের দর্শন যার ঔরসে ডিকেন্‌স্‌-এর জন্ম।

'ঝড়'-এ যে সময়কার চিত্র আঁকা হয়েছে সে হল বিরাট অভ্যুত্থান আর অতুলনীয় সংগ্রামের সময়। বইয়ের শেষে বিজয় অর্থাৎ জনতার আনন্দ-উল্লাস ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এই আনন্দ-উল্লাসের সঙ্গে জড়িত আছে বহু মানুষের ব্যক্তিগত ট্র্যাজিডির কথা—যে মানুষেরা যুদ্ধে তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে। পারিবারিক টেবিলের ধারের এই জমায়েতগুলি শূন্য আসনগুলির দিকে তাকিয়ে থেকেছে ও উপলব্ধি করেছে—তাদের এই নিরানন্দই হল লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্যের সমৃদ্ধির জন্য তাদের অকাতর আত্মত্যাগের স্বাক্ষর। 'ঝড়'-এর 'বিয়োগান্তক' সমাপ্তির সঙ্গে ডিকেন্‌স্‌-এর 'মিলনান্তক' সমাপ্তির এই হল মৌলিক পার্থক্য। সোভিয়েত মানুষের জটিল সুর-লহরীকে কেবল হাওয়া-যন্ত্রের (Wind instrument) মধ্যে রাখা সম্ভব নয়। মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও দুঃখকে বাদ দিয়ে মানুষের আভ্যন্তরিক জীবনের সরলীকরণের চেষ্টাও অসম্ভব। ছোট বড় যে-কোন লেখক মানুষের চিত্রই আঁকবেন—ডায়েগ্রামের উপযোগী বাঁধা-ধরা নক্‌শা আঁকবেন না।

যুদ্ধের পর ফরাসী বুর্জোয়া সমাজের প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের লেখা কিছু উপন্যাস আমি পড়েছি। সেগুলি পড়ে কখনো আমার হাসি পেয়েছে, কখনো আমার রাগ হয়েছে, কিন্তু সেগুলি কখনই আমাকে বিমোহিত করেনি। তাঁরা একটা নক্‌শা ধরে চলেন—প্রথম পরিচ্ছেদ : নায়কের সঙ্গে নায়িকার সাক্ষাৎ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নায়িকা সম্বন্ধে নায়কের সন্দেহ ; তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নায়িকার সঙ্গে নায়কের সাক্ষাৎ ও তার সম্বন্ধে সন্দেহের অবসান ; চতুর্থ পরিচ্ছেদ : নায়ক সম্পর্কে নায়িকার সন্দেহ ; পঞ্চম পরিচ্ছেদ : উভয়ের সাক্ষাৎ ও পরস্পরের সন্দেহের অবসান ; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আবার নায়িকা সম্পর্কে নায়কের সন্দেহ ; সপ্তম পরিচ্ছেদ : পর্যায়ক্রমে নায়ক সম্পর্কে নায়িকার পুনঃসন্দেহ ; অষ্টম পরিচ্ছেদ : উভয়ের সাক্ষাৎ ও পরস্পরের মধ্যেই সন্দেহ, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উপন্যাসের কোন্ জিনিস আমার মধ্যে হাসি ও রাগের সঞ্চার করল? তার বিষয়বস্তু। প্রেমকে কেন্দ্র করে আশ্চর্য আশ্চর্য উপন্যাস লেখা হওয়া সত্ত্বেও সে বিষয়বস্তু একেবারেই পুরনো হয়ে যায়নি। সন্দেহ, কলহ ও প্রেমের সুখানুভূতিকে কেন্দ্র করে লেখা আধুনিক প্রেমের গল্প পড়তে আমার ভালই লাগে। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া উপন্যাস খারাপ—তার কারণ, তাতে জীবন্ত মানুষ অনুপস্থিত। দুটি সাক্ষাৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে নায়ক কী করছে? পেশা, ভাবনা-চিন্তা, বন্ধু-বান্ধব—এ সমস্ত তার নিশ্চয়ই আছে। নায়িকাও নিশ্চয়ই কেবল প্রেম সম্পর্কিত সন্দেহে বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু পাঠকদের কাছে তাদের জীবন, তাদের কাজকর্ম, তাদের পরিবেশ সমস্ত কিছু অজানা থেকে যায়। তার কাছে নায়করা শেষ পর্যন্ত পুতুলেরই সামিল—যারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, চুম্বন করে এমন কি কথাও বলে কিন্তু কখনই অনুভব করতে পারে না।

উপন্যাস ভালবাসার শক্তি সঞ্চারিত করবে। কিন্তু বুর্জোয়া উপন্যাসে না আছে ভালবাসা, না আছে রক্ত-মাংসের মানুষ।

আমরা ভাল ভাল বই লিখেছি, আর বর্তমানে পশ্চিমী পাঠকেরা আমাদের বইয়ের অপেক্ষায় বসে থাকে যেমন ভাবে খনির শ্বাসরোধী খাদে মানুষ বসে থাকে টাটকা বাতাসের অপেক্ষায়। শ্রেষ্ঠ রাশিয়ান উপন্যাস কোনদিনই নাচ ঘর আর মেয়েদের নিভৃত কামরার উপন্যাস নয়। সোভিয়েট মহাকাব্য সাহিত্যের সঙ্গে সবচেয়ে মহৎ বিষয়বস্তুর—সৃষ্টিশীল শ্রমের বিষয়বস্তুর পরিচয় ঘটিয়েছে। কিন্তু এখানে অতি সরলীকরণ ও ছকে ফেলার চেষ্টার ফলেই অকৃতকার্যতা চোখে পড়বে। কিছুকাল আগে জনৈক শিক্ষানবিসের লেখা এক উপন্যাস পড়েছিলাম। তার সংক্ষিপ্তসার হল: প্রথম পরিচ্ছেদ: আইভানভের নতুন কর্মপদ্ধতির পরিকল্পনা; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আইভানভের পদ্ধতি সম্পর্কে পেট্রভের সন্দেহ; তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আইভানভ কর্তৃক তার পদ্ধতির যাথার্থ্য সম্পর্কে পেট্রভের সন্দেহ অপসারণ; চতুর্থ পরিচ্ছেদ: তৎসত্ত্বেও পেট্রভের সন্দেহ পোষণ; পঞ্চম পরিচ্ছেদ: কেন্দ্রীয় সরকারের তরফের এক কমরেডের আগমন ও তার কাছে আইভানভের পরিকল্পনার উল্লেখ; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: কেন্দ্রীয় সরকারের কমরেডটির কাছে পেট্রভের সন্দেহ প্রকাশ; সপ্তম পরিচ্ছেদ: কেন্দ্রীয় সরকারের কমরেড কর্তৃক পেট্রভ ও আইভানভের মধ্যে আপস রফা।

বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নেই; সমস্তটাই বাস্তবে ঘটে থাকতে পারে। সোভিয়েট জনসাধারণের জীবনে শ্রম অত্যন্ত মহৎ আসনে প্রতিষ্ঠিত, আর এটা স্বাভাবিক যে আইভানভের আবিষ্কার বহু লোককে আলোড়িত করবে। আমরা জানি যন্ত্র নির্মাণ এবং সাহিত্য রচনা—কোন কর্ম-জগতেই নতুন কিছু উপস্থিত করা সহজসাধ্য নয়। তাই বুঝতে পারি যে আইভানভের পরিকল্পনা প্রথমেই সাধারণের সমর্থন পায়নি। কিন্তু সোভিয়েট নাগরিক আইভানভ হাল ছেড়ে দেয় না—সত্যকে জয়ী করার চেষ্টা করে। উপন্যাসের নকশায় যে কোন দোষ আছে তা নয়, দোষ হল যে সমস্ত উপন্যাসটাই কেবল একটা নক্শা মাত্র। দুটি মিলন ক্ষেত্রের অন্তর্বর্তী সময়ে নায়কেরা কি করল পাঠকেরা সে সম্পর্কে অজ্ঞান। আইভানভ কি বিয়ে করেছিল? তার স্ত্রী কি তাকে সমর্থন করত? তার ব্যক্তিগত জীবনে সে কি অসুখী ছিল? পেট্রভ কি সংগীত ভালবাসত? হয়তো তার আত্মপ্রত্যয়ের অভাবের পেছনে কোন হতাশা রয়ে গিয়েছিল যা সে তার বন্ধুদের সংস্পর্শে এসে পেয়েছিল? হয়তো কেন্দ্রীয় সরকারের কমরেডটির ছেলে ভয়ানক রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিল? মানুষের জীবন বড় জটিল কিন্তু যখন আপনি তার জাঁকজমক-প্রাচুর্য কেড়ে নেন পাঠকদের চোখে তারা প্রাণহীন ঠেকে; ফলে পাঠকেরা না বিশ্বাস করেন তাদের আবিষ্কার আর সন্দেহ, না বিশ্বাস করেন তাদের সৃষ্টিকাজ।

লেখকদের আমরা বলি মানবাত্মার কারিগর। এই আখ্যার ফলে তাঁদের ওপর অনেকগুলি কর্তব্য ন্যস্ত হয়েছে। লেখক কি নিজেকে কেবল কারিগরের কাজটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন এবং উপন্যাসকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বর্ণনায় পর্যবসিত হতে দেবেন? সম্প্রতি এক তরুণী মহিলা তার সদ্য-পঠিত এক বই সম্পর্কে আমাকে লিখে জানিয়েছেন: কারখানার বর্ণনা আমার খুবই ভালো লেগেছে কিন্তু এন—যিনি এ যুগের অসাধারণ কীর্তির কথা বলছেন—কেন সেই কীর্তিসম্পন্নকারী মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন না? পাঠক উন্নত হয়েছে; সে বইয়ে কেবল ঘটনার বাহ্যিক চিত্রকল্পই খোঁজে না, গভীর মননশীলতা ও আবেগের সন্ধানও করে; সে চায় মহৎ যুগ মহৎ সাহিত্যের জন্ম দিক।

মহৎ শিল্প জীবনকে নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রতিফলিত করে না। তাতে অংশ গ্রহণ করে তাকে রূপান্তরিত করে। যুগ যুগ ধরে ডন কুইক্সোট পৃথিবীময় বিচরণ করে বেড়াচ্ছে; হ্যামলেট আত্মনিগ্রহের শিকার হয়ে আছে যুগ-যুগান্তব্যাপী। লেখকেরা তাঁদের নায়কদের জীবিত ব্যক্তিদের নাম দিলেই শৈল্পিক বিকাশের যুগ বোঝায় না

বরং জীবিত ব্যক্তিকে কাল্পনিক ব্যক্তির নাম দেওয়ার মধ্যে সেই দিক। সূচিত হয়। গোগোলের আগে মানিলভ, সোভাকেভিচ, নজদ্রভদের অস্তিত্ব ছিল? ছিল বৈকি। কিন্তু তারা এলোমেলো ভাবে বাস করত। তাদের চারপাশের মানুষ তাদের ঠিক চিনে উঠতে পারত না। কিন্তু মৃত আত্মা (Dead Souls) রচিত হবার পর কী হল? লোকে বলতে লাগল "গতকাল অমুক লোকের সঙ্গে দেখা—লোকটা ঠিক মানিলভ-এর মত।" বা "দেখ, দেখ, ঐ লোকটা খাঁটি নজদ্রভ!" শাটস্কির কথা মনে করুন। গ্রিবোডভকে কেউ তার মডেলের কথা জিজ্ঞেস করবে না। কিন্তু শাটস্কি দৃঢ়ভাবেই রুশীয় সমাজ জীবনে প্রবেশ করেছে।

অনেক সময় কোন একটি ঘটনার বিবরণকে অসম্ভব বলে মনে হয়, সত্যিকার কথোপকথনের বিবরণকে মনে হয় কৃত্রিম। পাসপোর্টের ফোটোর চেয়ে প্রাণহীন জিনিস আর কিছু নেই। অথচ গোয়া ও গোগোল-এর চিত্রের বাস্তবতায় আমরা বিশ্বাস করি।

আমার মনে হয়, আমাদের যুগ আজও নতুন বিষয়বস্তুর উপযোগী আঙ্গিক খুঁজে পায়নি। মাঝে মাঝে আঙ্গিকের সন্ধানকে আঙ্গিক-সর্বস্বতা (formalism) বলে অভিহিত করা হয়। আমার ধারণায় আঙ্গিক-সর্বস্ব লোক বলতে বোঝায় এমন লোক যার মানসিক ঐশ্বর্য নেই, এমন লোক যে কথা বলতে জানে অথচ যার কোন বক্তব্য নেই। সে-লোক সুকৌশলে পুরনো আঙ্গিকের ব্যবহার করতে পারে ও উদ্ভট নতুন আঙ্গিকও উদ্ভাবন করতে পারে—কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে আঙ্গিকসর্বস্ব লোকই বলব। সংক্ষেপে, আঙ্গিক-সর্বস্বতার অর্থ আঙ্গিক সম্বন্ধে আগ্রহ নয়, আঙ্গিক-সর্বস্বতার অর্থ বিষয়বস্তুর অনুপস্থিতি।

আমাদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি ব্যক্তি বা পরিবারকে নিয়ে রচিত আর সেইটাই তাদের কাঠামো নির্ণয় করেছে। আজ ব্যক্তির মূল্য আরও বহু মূল্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, একটি মানুষের কাহিনী অনিবার্যভাবেই বহু মানুষ ও সমাজ কাহিনীতে পরিব্যাপ্ত। নতুন বিষয়বস্তুর উপযোগী নতুন আঙ্গিক লেখককে তৈরি করতে হবে। প্রাচীন গ্রীক নাটক—তার স্থান ও কালের সমন্বয়ের কথা ভাবুন দেখি—সেই সময়কার ছন্দের গতিবেগের প্রভাবে তা দৃশ্যের ধারাবাহিকতার সামনে হটে এল। পশ্চিমে সামাজিক উপন্যাসের অন্যতম পূর্বাচার্য এমিল জোলা বালজাক-এর সমৃদ্ধ রচনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি; তিনি আরও ব্যাপকভাবে দৃষ্টি প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন দৃশ্যের আরও দ্রুত ধারাবাহিকতা। আমি আবার বলছি: প্রত্যেক লেখকই তাঁর আঙ্গিক খুঁজে নেন;

তার কোন বাঁধা-ধরা ফরমুলা নেই। তরুণ লেখক যিনি অতীতের রেখে যাওয়া সুসমৃদ্ধ ঐশ্বর্য থেকে কিছু গ্রহণ করতে চান, তিনি পুরনো শিল্পীদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করবেন কিন্তু তাঁদের অনুকরণ করবেন না। যে-কথা আমি রচনা সম্বন্ধে বলেছি ঠিক সেই কথাই ছন্দের গতিবেগ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। টলস্টয়, টুর্গেনিভ—এঁদের অসাধারণ রচনা-কৌশল আমাদের সামনে রয়েছে। এঁদের উপন্যাসের ভাষা কেবল ঐশ্বর্যমণ্ডিতই নয়, প্রাণবন্তও। কিন্তু ছন্দের গতিবেগে পরিবর্তন এসেছে। যদি সোভিয়েট উপন্যাসের নায়কেরা মন্থরগতিতে সুদীর্ঘ কুৎসাপূর্ণ বক্তৃতা করতে শুরু করে তাহলে তা লেখার রীতি বলে নয়, উৎকট রকমের রীতিপ্রিয়তা বলেই নিন্দিত হবে।

আমাদের কতকগুলি তরুণ লেখকের পাণ্ডুলিপি পড়ে তাঁদের শব্দ ব্যবহারের দৈন্য দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। তাঁরা অনেকেই রুশ ভাষা ব্যবহার করে না—ব্যবহার করে একটি বিশেষ ভাষা, কদর্য সাংবাদিক ভাষা, এস্পারেন্টোর মতই যার ছন্দ সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, নীরস এবং অক্ষম। দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা প্রকাশের কাজে এই ভাষা উপযোগী হতে পারে কিন্তু 'এ-যুগের বীর' (A hero of our time) বা শেকভের গল্প লেখার কাজে তা একেবারে অচল। কোন কোন শিক্ষানবিস তার গল্পের দৈন্যকে ঢাকবার জন্যে প্রচুর পরিমাণে জোরালো কথা ও উৎকৃষ্ট বিশেষণ ব্যবহার করে। এ প্রসঙ্গে আমার অনেক সময় ভুয়া পালোয়ানদের কথা মনে পড়ে যারা পিচবোর্ডের গায়ে ২০০ পাউণ্ড লেখা ওজন তুলে থাকে। ফলে শব্দ বৈচিত্র্যের সমস্ত অনুভূতিই নষ্ট হয়ে যায়। আমি এক শিক্ষানবিসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তোমার মতে কোন্‌টা জোরালো—তোমায় আমি ভালবাসি না তোমায় আমি খুব ভালবাসি", দ্বিধাহীনভাবে সে বলল, "তোমায় আমি খুব ভালবাসি-টা—নিশ্চয়ই....।" আমার মনে হয় দু-তিনটি গল্পের লেখক এই তরুণ যুবকটির চেয়ে যে-কোন মেয়ে পাঠক এই শব্দগুলির মর্মার্থ বেশী জানে।

আমি 'উদ্দেশ্যবাদ' সম্পর্কেও কিছু বলব। আমার বিশ্বাস শিল্প সর্বদাই উদ্দেশ্যবাদী, কারণ, তা জীবিত মানুষের প্রেম, ঘৃণা, ক্রোধ, সহানুভূতি, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে। শিল্পী মাত্রার রকমফের করেন, রংয়ের জৌলুস বাড়িয়ে তোলেন, নির্দিষ্ট কতকগুলি কথার ওপর জোর দেন আর বাকিগুলি বাদ দেন। উপন্যাসের লেখক তার নায়কদের আশৈশব-আমৃত্যু জীবন জানতে পারেন এবং জানা উচিতও। কিন্তু তাই বলে তিনি তাদের প্রতিটি দিনের

জীবন লিখবেন না, তাদের মানসের পরিণতির জন্যে যা জরুরী তা-ই লিখবেন।

পাঁচ বছর আগে আমি অন্যতম বিখ্যাত ফরাসী চিত্রশিল্পী অঁারি মাতিসের কাছে নিজের ছবির জন্যে পোজ করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে শিল্পে উদ্দেশ্যবাদ সম্পর্কে কথা বলি। মাতিস একটু অসুস্থ বোধ করায় আধহেলানো অবস্থায় কাজ করছিলেন। তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে একটা হাতী নিয়ে আসতে বললেন। মেয়েটি একটি আফ্রিকান নিগ্রো মূর্তি নিয়ে এল। উন্মত্ত অবস্থায় হাতীটিকে খোদায় করা হয়েছে। মাতিস জিজ্ঞেস করলেন মূর্তিটি আমার ভালো লেগেছে কি না। আমি বললাম, "হ্যাঁ"।

"এর মধ্যে কোন কিছু অস্বাভাবিক ঠেকছে না আপনার কাছে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বললাম, "না"।

"আমার কাছেও ঠেকছে না। কিন্তু একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। শুধু ওর শুঁড়টা নয় দাঁতগুলো পর্যন্ত উঁচুতে উঠে আছে। এক আহাম্মক এসে বলল—"দাঁতগুলো কখনও উঁচুতে উঠে থাকতে পারে না। পরের বার ভাস্কর তার কথা মত কাজ করলেন।" মাতিস তাঁর সেক্রেটারীকে দ্বিতীয় হাতীটি নিয়ে আসতে বললেন। এটি অতি সাধারণ একটি মূর্তি। মাতিস বললেন, "দেখছেন, এবার দাঁতগুলো ঠিক তার জায়গায় আছে। কিন্তু এ আর শিল্প রইল না...।"

আমাদের সাহিত্যের ওপর জীবনকে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। খাঁটি শিল্প সে কাজ করতে পারে কিন্তু ক্যামেরার ছবি তা পারে না। মহৎ ব্যক্তিরা কথার সাহায্যে নানা হৃদয়কে উদ্দীপিত করার দায়িত্ব আমাদের ওপর দিয়ে গেছেন। এর জন্যে লেখক সংঘের সভ্য-কার্ড পকেটে থাকাটাই যথেষ্ট নয়। এর জন্যে আপনার উদ্দীপিত হৃদয় থাকা চাই, আপনার লেখক হওয়া চাই।

কবিতার নির্মাণ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

পল এলুয়ার

সত্যিকার কবিরা কখনো মনে করেনি কবিতার ওপর একমাত্র তাদেরই অধিকার। মানুষের ঠোঁটে কবিতা কখনো শুকিয়ে যায়নি; গান, চিৎকার অন্তহীনভাবে একের পর এক আসে, পরস্পরের সাক্ষাৎ পায়, সংঘর্ষ লাগায়, মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কথন-ক্রিয়ার বেগকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অতিরঞ্জন পর্যন্ত, উদ্বেলতা পর্যন্ত, অসংলগ্নতা পর্যন্ত। শব্দরা বলে পৃথিবীর কথা এবং শব্দরা বলে মানুষের কথা, যা মানুষ দেখে এবং অনুভব করে, যা আছে, যা ছিল, যা থাকবে, আদিমকাল, অতীত, যুগের এবং মুহূর্তের ভবিষ্যৎ, ইচ্ছা, ইচ্ছানিরপেক্ষতা, যা অস্তিত্বে নেই এবং যা অচিরে অস্তিত্বে আসবে তার সম্বন্ধে ভয় ও কামনা। শব্দরা ধ্বংস করে, শব্দরা আগাম বলে; সম্বদ্ধই হোক অথবা অসম্বদ্ধই হোক,তাদের অস্বীকার ক'রে কোনো লাভ নেই। সত্যের বিশদ ব্যাখ্যানে তারা সবাই অংশগ্রহণ করে। তারা যেসব বস্তু, ঘটনা, ভাবনা বর্ণনা করে সেগুলো শক্তির অভাবে অবলুপ্ত হতে পারে, তবে এটা নিশ্চিত যে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরা তাদের জায়গা নেবে, যে-অন্যদের তারা দৈবক্রমে উজ্জীবিত করেছে এবং এরাই তাদের সমগ্র বিবর্তনকে সম্পূর্ণ করবে। মানুষেরা একটা অভিধানকে গলাধঃকরণ করেছে, তারা যার নাম করে তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। নামহীনের, সকল শেষ-প্রান্তের আরম্ভ শুধু অকল্পনীয় মৃত্যুর সীমান্তে। কে বলছে, তাতে কিছু আসে যায় না, এমনকি সে কি বলছে তাতেও কিছু আসে যায় না।

কথা সব মানুষেরই স্বধর্ম, ভাষার পার্থক্য, তা সে যতই ক্ষতিকর বলে আমাদের মনে হোক না কেন, মানব-ঐক্যকে খুব বিপন্ন করে না, বরং তাকে

বিপন্ন করে কথার পরম স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহারিক যুক্তির নামে সদাঘোষিত নিষেধবিধি। যারা শেখায়, একটা জিনিসকে দেখার এবং বর্ণনা করার হাজার রকম পদ্ধতি আছে, মানুষের প্রেম, আনন্দ ও যন্ত্রণার কথা বলার হাজার রকম পদ্ধতি আছে, জীবন বৃক্ষের একটা শাখাও না ভেঙে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার হাজার রকম পদ্ধতি আছে, তাদের মনে করা হয় উন্মাদ। ভিড়ের মধ্যে যে সামান্য কণ্ঠ অনুযোগ করে, অথবা গান করে, কিন্তু জানেনা সে মহিমাময়, সেই কণ্ঠকে যারা আবিষ্কার করে, প্রতিধ্বনিত করে, তার ভাষ্য করে, তারা নাকি অপ্রয়োজনীয়, উন্মাদ অভিশপ্ত। হায়, একান্ত ব্যক্তিগত কবিতার মেয়াদ এখনো ফুরোয়নি। কিন্তু, অন্তত, এটা আমরা বুঝেছি যে, ব্যক্তিবিশেষ নিরপেক্ষ কবিতার ক্ষীণ সূত্রকে কোন কিছুই ছিঁড়ে ফেলতে পারেনি। এই সত্য যে জয়ী হবে সে সম্বন্ধে এক মুহূর্তের জন্যেও সন্দিহান হ'য়ে আমরা বুঝেছি কত জিনিষ রয়েছে, যা 'আগাগোড়া একটা কবিতা' হতে পারে। এই শ্লেষাত্মক নিন্দাসূচক কথাটিকে *সদিচ্ছাসম্পন্ন কবিরা তার আক্ষরিক অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছে। ইচ্ছানিরপেক্ষ, বস্তুগত উপাদানকে, চলমান জীবনের আপাত অপ্রবেশ্যতার নিচে এবং মানুষের নিরীহতম উৎপাদন সমূহের মধ্যে যা কিছু নিহত, তাকে তারা কাজে লাগিয়েছে। আগাগোড়া একটা কবিতা, এটা এখন আর শুধু একটা অদ্ভুত বস্তু নয় অথবা কোন সঘননিঃশ্বাস বিলাসিনীর উৎকেন্দ্রিক আচরণ নয়, এ হ'ল তাই যাকে বাস্তব সদৃশ করা, প্রতিরূপে তুলে ধরা, উদ্ভাবন করা কবির কৃত্য, যদি সে বিশ্বাস করে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া এই পৃথিবী থেকেই তার স্বপ্নের বিশ্ব জন্ম নেবে। তার এই সাধারণ কর্মে অসামান্যও কিছু নেই, ঐশ্বরিকও কিছু নেই। পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন বার্তার সন্ধানে জাগ্রত থেকে কবি আমাদের অর্পণ করবে বিশুদ্ধতম কথার আনন্দ, রাস্তার মানুষ এবং প্রাজ্ঞের, রমণীর, শিশুর এবং উন্মাদের কথার আনন্দ। ইচ্ছে করলে কেবল আশ্চর্যকেই পাওয়া যাবে। মাথা না ঘামিয়ে আমরা যেন তাদের শুনি এবং উত্তর দিই, তাহলে আমাদের কথাও শ্রুত হবে। নইলে আমরা শুধু ভাঙা আয়না, আমরা বহিরঙ্গ ঠিক করবার আকাঙ্ক্ষার কাব্যি করব, যে-স্থান এবং কাল আমাদের সেখানে আমরা বস্তুর প্রাথমিক ও মৌলিক রূপ আমাদের চোখ থেকে সরিয়ে দেব।

আমরা চাইলে কিছুই আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে না। যে সব চেয়ে নিঃস্ব,

---

* চলতি ফরাসীতে এই শব্দগুচ্ছকে কাব্যের বা কোন কিছুর অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি অর্থে ব্যবহার করা হয়। —অ. মি.

সে সবচেয়ে বিত্তবানের মতোই তার যত্নবান হাত এবং আত্মবিশ্বাসী চোখ মারফৎ আমাদের দিতে পারবে এক অমূল্য সম্পদ, তার স্বপ্ন এবং তার বাস্তব, যাকে যুক্তি, ব্যবহারিক বোধ এবং দুষ্টু বুদ্ধি শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করতে অপারগ। যতই তুচ্ছ, যতই অসম্পূর্ণ, যতই স্থূল হোক না কেন, ইচ্ছানিরপেক্ষ কবিতা নির্মিত হয় জীবন এবং পৃথিবীর, স্বপ্ন এবং প্রেমের, প্রেম এবং প্রয়োজনের পারস্পরিক সম্পর্ক দিয়ে। সে আমাদের আবেগের জন্ম দেয়, সে আমাদের রক্তকে অগ্নির লঘুতা দেয়। প্রত্যেক মানুষ প্রোমিথিউসের সোদর। আমাদের কোনো বিশেষ এক বুদ্ধি নেই, আমরা নৈতিক সত্তা এবং আমরা আমাদের জায়গা নিই ভিড়ের মধ্যে।

নতুন চোখে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

লুই আরাগঁ

অনেক লেখক আছেন যাঁরা লেখেন এমনভাবে যেন তাঁরা কখনও ভুল করেন নি। এঁরা অবশ্য নানা জাতের। কারুর লেখার ভাবখানা এমন যেন তাঁদের লেখার ভিতর দিয়ে পরম পিতা ঈশ্বর স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করছেন, কেউ কেউ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, নিয়তি তাঁদের গলায় সাহিত্যিক জীনিয়াসের বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছে ; আবার কেউ কেউ কমিউনিজম সম্বন্ধে এমন ভঙ্গীতে লেখেন যেন তাঁরা একেবারে জেনে ফেলেছেন কমিউনিজম কি ছিল, কি হয়েছে এবং কি হতে চলেছে। যাঁরা তাঁদের সঙ্গে একমত নন, তাঁদের সম্বন্ধে এই সব লেখকদের মনে আছে অবজ্ঞা, কৃপাদৃষ্টি। অন্যের লেখা যে তাঁরা পড়েন এমন নয়—কী দরকার পড়ার! পাতা উল্টেই তাঁরা নির্ঘাৎ বুঝে ফেলেন অপরাপর লেখকরা কি ভাবছেন।

এই ভাবভঙ্গী আমার কাছে অগ্রাহ্য। বহু লোক বহু পথ ধরে আলোর দিকে যাত্রা করে চলেছে ; কেউ বা চলেছেন ভীরু পদক্ষেপে, কেউবা চলেছেন পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ে ভরা শক্ত পা ফেলে। এঁদের সকলের সব পথ সম্বন্ধেই আমার কৌতূহলের অন্ত নেই। এও বিশ্বাস করি যে, আমি যতটুকু যা সত্যদৃষ্টি লাভ করেছি, তারও কোনো মূল্য নেই যদি আমিই কেবল হই তার এক ও অদ্বিতীয় অধিকারী। চক্ষুহীনদের মধ্যে একমাত্র চক্ষুষ্মান ব্যক্তি বলে গর্ব অনুভব করা দূরে থাক, আমি মনে করি যে, এমন দৃষ্টিশক্তির কোনো মূল্যই নেই যার কোন ভাগীদার নেই।

নতুন গলার আওয়াজ আমি কান পেতে শুনি। যা কিছু ঘটছে সাহিত্যে

—যেটা আমার পেশা—সে সম্বন্ধে আমার উদ্বেগ অসীম। আমি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক মানুষই লাভ করেছে কোন-না-কোন খণ্ড সত্য এবং সত্যের সেই বিশেষ খণ্ডটিকে আমি না পেয়ে থাকতেও পারি। প্রত্যেক মানুষই চলেছে সত্যের দিকে তার নিজস্ব চলনে এবং যদিই বা চোখে পড়ে তার পদস্খলন, তৎক্ষণাৎ স্মরণ করি নিজে কত ভুল পা ফেলেছি এবং এখনও কত ভুল পা ফেলতে পারি।

শুধু নিজের চিন্তা সম্বন্ধেই কুতূহলী হওয়া যদি আমার কাছে অর্থহীন হয়, আরো কত বড় পাগলামি হবে এই বিশ্বাস যে আর একজনের চিন্তা একেবারে খাপে খাপে মিলে যাবে আমার চিন্তার সঙ্গে। জগৎকে এইভাবেই দেখি যে, জগতের মূলে রয়েছে বিপরীত জিনিসের বিরোধ। এটি এমন সব নরনারীর জগৎ, যাদের পরস্পরের ঠোকাঠুকি লেগেই আছে, যারা জানেই না তারা নিজেরা কি, যদি না অপরের সঙ্গে তাদের বিরোধ বাঁধে। এ জগতে ছায়া ছাড়া আলো নেই। সুতরাং আলোছায়ার খেলা যে বইয়ে নেই, তার কোন মানেই হয় না। এমন বই না খোলাই উচিত। প্রাণহীন, শিলীভূত চিত্রের দ্বারা মানুষের আত্মাকে ভোলাতে যাওয়ার মতো বিপজ্জনক কাজ আর কিছুই নেই। এই যদি চান যে আপনাকে অবিরত কেবল ভরসার কথা শোনানো হবে—এমন সব কথা যা আপনার মনে কোনো প্রশ্ন জাগাবে না এবং যে-সব কথা আপনি আগে থাকতেই জেনে নিয়েছেন—তাহলে আমাকে দিয়ে আপনার চলবে না। কয়েক শত পৃষ্ঠার মধ্যে যে সাহিত্যজীবনের সব কিছু বিপদ, আপদ ও সমস্যাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তাকেই তো বলে ইউরোপীয় সাহিত্য। ইউরোপীয়ত্ব বড় ছলনাময়। ওটা লোকেদের ঘুম পাড়ায় এবং ঘুম ভেঙে যখন তারা বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আসে তখন তাদের অবস্থাটা হয় সেই সব স্বপ্নচারীদের মতো, ঘুমের ঘোরে যারা একেবারে ছাদের কিনারার কাছে এসে পড়েছে এবং ছাদ থেকে পড়ে যাদের নির্ঘাৎ মৃত্যু।

গত পঁচিশ বছর ধরে আমার এই অহংকার চলে আসছে যে, সমাজ সম্বন্ধে আমার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীটা যে রকমের অর্থাৎ আমি যেমন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি, বাস্তববাদী আর্ট সম্বন্ধে ঠিক তারই অনুরূপ একটা ধারণা আমি পোষণ করি। এই ধারণাটিকে বলা হয় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ। এটি এমন একটা ধারণা নয় যার কোনদিন কোন নড়চড় হতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ কাকে বলে? যদি এই প্রশ্নের শেষ ও চিরন্তন উত্তর চান, তাহলে এ বিষয়ে প্রচলিত সূত্রগুলিকে

মুখস্থ করতে হবে। কার্যতঃ দেখা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ জিনিসটিকে হরেক রকমে ব্যাখ্যা করা হয়। বহু ক্ষেত্রে এই নাম নিয়ে যা লেখা হয় তা বেশ একটু খেলো ধরনের বাস্তববাদ—কিংবা হয়তো মোটেই বাস্তববাদ নয়। তা হয়তো একটা ফোটো তোলার কায়দা, একপ্রকার প্রাকৃতিকবাদ; অথবা বলা যায় তা লোককলার একটা খেলো সংস্করণ এবং তারই গায়ে লেখক জুড়ে দেন 'খাঁটি শ্রমিক'-এর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে একটা তথাকথিত কমিউনিস্ট সুনীতি। সম্প্রতি এক প্রবন্ধে, Pierre Daix বেশ চমৎকারভাবে এই ধরনের বইকে বর্ণনা করেছেন 'বাৎসল্যপরায়ণ' বলে।

এই রকমের সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ আমার জন্য নয়। আমার কারবার সেই সব মানুষ নিয়ে যাদের ভাগ্য নিয়তির দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট নয়, যাদের মন আগে থাকতেই ওই জিনিসটা মেনে নেয়নি যেটাকে তারা মনে করে রাজনৈতিক প্রয়োজন বলে। যে সব বই মোটেই এরকম ভান করে না যে, তারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেই সব বইয়েই আমি এমন সব জিনিস খুঁজে পেয়েছি যেগুলিকে অবিকল সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের আলোয় পরীক্ষা করে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং নিজেকে বাড়াতে পেরেছি। আমার সব কিছু বিশ্বাসের ফলে যেটিকে আমি সকল আর্টের শেষ লক্ষ্য বলে মনে করি, সেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের দিকে এই সব বই-ই আমার বিচারশক্তিকে চালিত করেছে। যে পথের সন্ধান করছি তা খুঁজে-পেতে যে লেখক অজ্ঞাতে আমাকে সাহায্য করছেন, মতামতের দিক থেকে তাঁর সঙ্গে আমার কোন মিল না থাকতেও পারে; এমনকি তাঁর ধ্যানধারণা হয়তো আমাকে শত্রুর মতো আঘাত করতেও পারে।

বড় দুঃখ হয় তাঁদের দেখলে যাঁরা নিজের ধ্যানধারণা ছাড়া অন্য কিছু বইয়ের মধ্যে দেখলে সইতে পারেন না, যাঁরা বিরোধী ধ্যানধারণার মধ্যে এমন কিছু পান না যা তাঁদের নিজেদের ধ্যানধারণার প্রসার ঘটাতে পারে। এমন সব লোক আছেন যাঁরা ছোট্ট একটা মোলায়েম, নির্বিরোধ জগৎ গড়েন। তাঁরা চান ভিন্ন মতের বই একপাশে ঠেলে ফেলে দিয়ে আরাম-কেদারায় শুয়ে শুধু ইউটোপিয়া সম্বন্ধে বই পড়তে। এতে করে শুধু সাহিত্যই যদি চাই যা মত ও পথ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলবে না, তাহলে কেবল স্বমতাবলম্বীদের জন্যই লেখকদের লিখতে হবে। তাহলে শ্রেণীস্বার্থের অতিশয় তর্কাধীন সাফাইয়ের আড়ালে সাহিত্যের জাতীয় চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে, তার বিশ্বসম্পৃক্তির কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না।

একথা বলছি না যে, সাহিত্যে কদাচ শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী থাকা উচিত নয়। সাহিত্যিকদের রচনায় সর্বদাই একটা শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। প্রশ্নটা শুধু এইটুকু যে, শ্রেণীটি কোন্ শ্রেণী। কিন্তু লেখকের শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা এমন সব মূল্য সৃষ্ট হওয়া আবশ্যক, যা তাঁর শ্রেণী সীমানার বাইরেও স্বীকৃতি লাভ করবে। বুর্জোয়া সাহিত্য এমন অসংখ্য বই সৃষ্টি করেছে যেগুলি সেই সব নরনারীর মনে মূল্যবান প্রেরণা জুগিয়েছে, যাঁরা মোটেই বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক নন। এর উল্টোটাও কেন যে না ঘটবে তার কোন কারণ নেই। দুই ক্ষেত্রেই রচনাটির জাতীয় চরিত্রই হবে তার মূল্যায়নের মাপকাঠি। রচনাকে সার্থক করে তুলতে হলে তাকে জাতীয় সাহিত্যভূমিতে স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ সার্থক সাহিত্য সমসাময়িকদের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কোন পরম পুরুষের লেখা নয়। সমসাময়িক সাহিত্যের গর্ভ থেকে এবং জাতির সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকেই ভাল বই জন্মায়। যে লেখক অল্পবুদ্ধির বলে সাহিত্যের জাতীয় জন্মভূমির সঙ্গে নিজের লেখার বিচ্ছেদ ঘটতে দেন, তিনি অপরাপর লেখকদের স্বার্থকে নয়, নিজের স্বার্থকেই আঘাত করেন। যে পরিবেশে শ্বাসগ্রহণের দ্বারা শিল্পকৃতি বেঁচে থাকতে পারে, তার থেকে যে লেখক নিজেকে বঞ্চিত করেন, তাঁকে দেখে মনে হয় জলের মাছ ডাঙ্গায় উঠে খাবি খাচ্ছে।

অতীতে সাহিত্যের যে সব শাখা গড়ে উঠেছিল তারা প্রত্যেকেই নিজেদের এক-একটি অচলায়তন রচনা করেছিল। যা কিছু নিজেদের সঙ্গে মিলত না তাকেই তারা নরকস্থ করত। ঘরের লোক ছাড়া বাইরের সবার সঙ্গেই চলত তাদের বিবাদ। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ এই রকম অচলায়তনের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে না। এইখানটায় সাহিত্যের অতীত শাখাগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মূলগত পার্থক্য রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই চলতে পারে এবং নিজের বিরোধী জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে, এমনকি, আত্মস্থ করতেও তা সক্ষম। কেননা কোন বিশেষ স্টাইলের জয়লাভের পরিবর্তে জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা সৃষ্টি করাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের লক্ষ্য। আমি জানি যাঁরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের বড়াই করেন তাঁরা অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন না—কিন্তু এ বিষয়ে আমি অসহায়।

আমার মতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে এইভাবে দেখা ছেলেমানুষী, যেন একটি যুধ্যমান শিল্পপদ্ধতি নিজের চারপাশে ব্যূহ রচনা করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে লড়াইয়ে নেমেছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্বন্ধে আমার নিজের

দৃষ্টিভঙ্গী গণ্ডীবদ্ধ নয়। আমার বিশ্বাস যিনি এই শিল্পপদ্ধতির অধিকারী বলে গর্ববোধ করেন, তাঁর উচিত এই পদ্ধতির সাহায্যে নিজের শিল্পকর্মকে সমৃদ্ধ করে তোলা। তা করতে গেলে এমনটি চলবে না যেন নিজের বেড়া দেওয়া একটুখানি জমিতেই বিচরণ করছি। সর্বসাধারণের জন্য যে জমি রাখা হয়েছে তার যেখানে যেখানে উৎকৃষ্ট তৃণের সম্ভাবনা বিদ্যমান, সর্বত্র বিচরণ করতে হবে—অবশ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা সবিচারে কিছু বর্জনও আবশ্যক।

সাহিত্যের অভিযানে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ অগ্রণী কিন্তু তাই বলে মনে ভাববেন না যেন অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। 'আপন' এবং 'পর', এই দুই ভাগে যদি সাহিত্যকে ভাগ করেন তাহলে সাহিত্যের জীবন্ত দেহটার অঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘটবে এবং আপনি যে কাহিনীটার বড়াই করছেন, তা হয়ে পড়বে একটি কর্তিত ও মৃত অঙ্গবিশেষ। সাহিত্যের অগ্রণীবাহিনীর সঙ্গে সমগ্র সাহিত্যের যোগসূত্র যদি ছিন্ন করে দেন, তাহলে যাঁরা অপরাপর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লিখছেন এবং যাঁরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের সঙ্গে তাঁদের নিজ নিজ শিল্পকর্মের উপাদানগত ঐক্য সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নন, আপনার বাহিনীতে তাঁদের যোগদান কি করে দেখতে পাবেন? ফলে সাহিত্যের অধঃপতন ঘটবে না, ঘটবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের অধঃপতন। সরু মোটা নানা গলায় অন্যেরা ঠিক এই কথাটাই বরাবর আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করে আসছেন; অর্থাৎ কিনা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ টিকবে না এবং যাঁরা এটিকে ভজনা করছেন তাঁরাও এটিকে ছেড়ে দেবেন। যেমন ধরুন আমি নিজে।

এইবার বাস্তববাদ সম্বন্ধে বলব।

১৮৮৩ সালে 'সাহিত্যে বাস্তববাদ সম্বন্ধে মন্তব্য' নামক নিবন্ধে বিরাট ইংরেজ ঔপন্যাসিক রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন লিখেছেন: 'গত শতাব্দীর তুলনায় আজকের সাহিত্যে যে বিপুল পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তার মূলে রয়েছে সাহিত্যকর্মে বিস্তারের প্রবর্তন'। ষ্টিভেনসনের উক্তিটিকে তাঁর সমগ্র লেখাটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে তবেই তার পূর্ণ অর্থ গ্রহণ সম্ভব। তবে বিস্তার (detail) কথাটিকে তিনি কিভাবে ব্যবহার করেছেন তা অনুধাবন করলে বোঝা যায় ষ্টিভেনসন কি বলতে চান। শিল্পকলায় পর্যবেক্ষণের অস্তিত্ব অবশ্য সর্বকালেই দেখা গিয়েছে। যেমন ধরুন, মধ্যযুগের চিত্রকলায় পর্যবেক্ষণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়; কিংবা ধরুন অষ্টাদশ শতাব্দীতে (বা যে কোন শতাব্দীতে) এমন কোন উপন্যাস লেখা হয়নি যার মধ্যে কিছু না কিছু বাস্তবানুগ পর্যবেক্ষণ নেই।

কিন্তু বিস্তার অন্য জিনিস। বিস্তারণই এক শ্রেণীর রোম্যান্টিকবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এইখানটাতেই রোম্যান্টিকবাদের সঙ্গে চিরায়তবাদের অমূর্তায়নের পার্থক্য। ষ্টিভেনসন নিজে অবশ্য উঁচুস্তরের বাস্তববাদী। কিন্তু স্বভাবতই তিনি স্বযুগের পরিভাষাই ব্যবহার করেছেন। বিস্তারতন্ত্রের সঙ্গে ষ্টিভেনসনের বিবাদের কারণ প্রাকৃতিকবাদী শিল্পকলায় আলোকচিত্রসুলভ খুঁটিনাটির অতিপ্রাচুর্য (ষ্টিভেনসন ভুল করে বাস্তববাদকে প্রাকৃতিকবাদের সঙ্গে এক করে ফেলেছেন; তাঁর মতে বাস্তববাদ রোম্যান্টিকবাদের একপ্রকার বিকৃতি)।

ষ্টিভেনসন যে বিস্তার শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেই শব্দটিকে আমি কিভাবে বুঝেছি, তা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। অতীতের অ-বাস্তববাদী শিল্পকলায় দেখা যায় যে, শিল্পীর পক্ষে খুঁটিনাটিকে পরিহার করে চলা অসম্ভব ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় **Vezelay**-এর খিলানে ও চ্যাপেলে, তৎকালীন স্বর্গ-নরকের বর্ণনায়, ভাস্কর্যের রূপায়ণে, নৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনার সাহিত্যিক উল্লেখে। **Breughl**-এর উদ্ভট কল্পনাময় দৃশ্যাবলীও খুঁটিনাটির দিক থেকে বেশ বাস্তববাদী। কিন্তু চিরায়তবাদ এবং বিশেষ করে ফরাসী চিরায়তবাদ, বর্ণনাকে পর্যবসিত করল একটা সেকেলে কৌশলে। চিরায়তবাদের সিংহাসনে বসল আইডিয়া (অর্থাৎ বিশদ পর্যবেক্ষণের অন্তরালে অবস্থিত তথাকথিত থিসিস)। তাই চিরায়তবাদ হয়ে উঠল রোম্যান্টিকবাদের বিরোধী। রোম্যান্টিকবাদের ভিতর দিয়েই ঘটেছিল বিস্তারের পুনর্জন্ম. হোক তা গথিক অথবা সমসাময়িক, স্কট অথবা বালজাক। এই বিবর্তনের শেষ প্রান্তবিন্দু জোলা। তাঁর হাতে, অন্ততঃ গোড়ার দিকে, বিস্তারণ কার্যটি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের মনোভাবের বিরোধী একটা সমালোচনা-মূলক ও রাজনৈতিক চেহারা লাভ করল।

প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত প্রাকৃতিকবাদী শিল্পকলায় বিস্তারণ-প্রক্রিয়া সমগ্র শিল্পকৃতির ভারবর্ধন না করে ক্রমশঃ হয়ে দাঁড়াল নিজেই নিজের চরম উদ্দেশ্য এবং ফলে গাছই বড় হয়ে উঠল, বন চলে গেল চোখের আড়ালে। বিংশ শতাব্দীতেই হোক বা অন্য কোনো যুগেই হোক, এমন শিল্পকলা সৃষ্টি করা কখনও সম্ভব হয়নি যা বিস্তার, পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে চলতে পেরেছে। যে-সব শিল্পকৃতিকে বাস্তববাদ থেকে সবচেয়ে দূরের জিনিস বলে মনে হয় তাদের ক্ষেত্রেও বিস্তারণের একটা মুখ্য ভূমিকা বিদ্যমান; এমনকি এই সকল শিল্পকর্মেই দেখা যায় সমগ্র দৃশ্যে খুঁটিনাটির সর্বাধিক প্রাধান্য। বিগ্রহবাদীদের বা সুররিয়ালিস্টদের বিরুদ্ধে একথা বলছি না, প্রুস্ট বা জয়েসের বিরুদ্ধেও নয়। আমার বক্তব্য শুধু

এইটুকু যে, বাস্তববাদের বিরুদ্ধে ভিন্নমতাবলম্বীরা অনেক মৌলিক বিশ্বাস ঘোষণা করেন বটে, কিন্তু এই সব ঘোষণার সাথী হিসেবে যে শিল্পকর্ম আবির্ভূত হয় তা বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে বেশী দূর চলতে পারে না। তফাতটা শুধু এইটুকু যে, বাস্তবাদী শিল্পকলা খণ্ড খণ্ড বস্তুসত্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কিন্তু অ-বাস্তববাদী শিল্প তা করতে নারাজ। অ-বাস্তববাদী শিল্পের বিস্তারকার্যে খুঁটিনাটির সামগ্রিক তাৎপর্যটিকে বাদ দিয়ে খণ্ডিত খুঁটিনাটিকেই জয়যুক্ত করা হয়।

শিল্পজগতের লড়াইয়ে যে প্রশ্ন ওঠে তা উদ্ভাবন বনাম পর্যবেক্ষণ-এর প্রশ্ন নয়। বিশুদ্ধ উদ্ভাবন অস্তিত্বহীন; অন্যদিকে পর্যবেক্ষণ ব্যতীত কোন শিল্পই চলতে পারে না। আসল প্রশ্নটি এই যে, শিল্পকৃতির প্রকৃত তাৎপর্যের উপরেই জোর দেওয়া হবে, না, তার তুচ্ছ ডালপালার উপরে। শিল্পের জগতে স্বাধীনতা বলতে বরাবর এই জিনিষটাই বুঝিয়েছে যে, শিল্পকর্মকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে; অন্যদিকে শিল্পীর দাসত্ব উদ্ভব হয়েছে সেই সব বহিঃশক্তির চাপে যারা চেষ্টা করেছে পর্যবেক্ষণকে সীমিত করতে এবং শিল্পকৃতিকে শিল্পী যে অর্থের দ্বারা মণ্ডিত করতে চান তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে।

শিল্পকলা বরাবরই স্বাধীনতার জন্য বিরাট লড়াই চালিয়ে এসেছে। যাঁরা এই স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চেয়েছেন, তাঁদের চোখে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিস্তারণ কার্যটি অনেক সময়েই বিপজ্জনক মনে হয়েছে, কেননা বিস্তারণের দ্বারা এমন সব ব্যাপার ফুটে বেরোনোর সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে যেগুলি নীরবে চেপে যাওয়াই এই সব ভদ্রলোকের অধিকতর মনঃপূত। আবার যখনই এঁরা আবিষ্কার করেন যে, শিল্পী বিশদ পর্যবেক্ষণের মধ্যে ডুবে থাকলে নিজের লড়াইয়ের ব্যাপারটিকে বেমালুম ভুলে যাবেন এবং বিস্তারের দিকে তাঁর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখলে তাঁর চোখের এই কথা বলে ঠুলি পরিয়ে দেওয়া সহজসাধ্য হবে যে তাঁকে খুঁটিনাটি দেখার সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে, তখনই শিল্পীর স্বাধীনতার শত্রুরা বিস্তারণকেই নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ হিসাবে অবলম্বন করেছেন। এই সব লোকেরা সর্বদা সৃজনশীল উদ্ভাবকদের বুলি ধার করেন সৃজনশীলতাকে খোঁড়া করে দেওয়ার জন্য।

এই ঘটনাই ঘটেছে প্রাকৃতিকবাদ বা তথাকথিত 'এক চাকলা জীবন' বলতে যা বোঝায় তার ইতিহাসে। সামগ্রিক তাৎপর্য থেকে বঞ্চিত বর্ণনারাশির দ্বারা সৃষ্টির প্রেরণাকে সীমিত করার জন্য প্রাকৃতিকবাদকে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং গলা মেলাতে হয় ওই আওয়াজের সঙ্গে যে, 'শিল্পের জন্যই শিল্প'।

এই কৈবল্যবাদী ব্যাখ্যা অবলম্বন করলে শিল্পীর পক্ষে পারিবারিক অ্যালবাম রচনা করা ছাড়া আর কিছু করণীয় থাকে না। হাসি পায় এই অ্যালবামটিকে দেখলে, যখন চোখে পড়ে মূর্তিগুলির সেকেলে পোশাক-পরিচ্ছদ, কিংবা যখন নজরে আসে, সেকালের সামাজিক অবস্থার পটভূমিতে এই পরিবারটির সত্যকার চেহারা অকস্মাৎ কি রকম ফুটে বেরিয়েছে। ইস্রায়েলের ভগবান একদা মানবমূর্তির অঙ্কনকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে, ভালো হোক, মন্দ হোক, এই নিষেধাজ্ঞাকে বলবৎ করার ক্ষমতাটি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী চায় পারিবারিক চিত্র সংগ্রহ করতে এবং তাই তার শিল্পীদের শুধু এই কাজেই লাগিয়ে রাখতে চায়।

শিল্পে কি কি জিনিস অনুমোদন করা হবে তার চরিত্র যখনই বদলায় শিল্পীর স্বাধীনতা নতুন করে বিপন্ন হয়ে পড়ে। মনে হয় বুঝি বা শিল্পের নতুন অভিব্যক্তির সঙ্গে তাল রেখেই নতুন নিয়মকানুন (Sanctions) রচিত হচ্ছে, কিন্তু কার্যতঃ তার উদ্দেশ্য হল শিল্পীর স্বাধীনতাকে খর্ব করা। একদা যে-সব কথা মানুষের মুখ দিয়ে বললে কেউ সহ্য করত না সেইসব কথা পশুপক্ষীকে দিয়ে বলানো হল। মহৎ সাহিত্যিক উদ্ভাবন সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি ধরুন, লেখকরা অনন্তকাল ধরে শুধু Roman de Renart-এর আবিষ্কারটারই চর্বিতচর্বণ করতেন? তাহলে যেসব বিধি-নিষেধকে লঙ্ঘন করাই উদ্ভাবনটির উদ্দেশ্য ছিল, তাদের কাছেই কি লেখকদের নতিস্বীকার ঘটত না? সাহিত্য ও শিল্পকলার ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরেই এই ব্যাপারটি দেখা যায়—আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও বটে, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও বটে।

আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আমরা পেয়ে আসছি বেশ একটা নতুন জিনিস, অর্থাৎ কাব্যে ফরাসী ছন্দের প্রবর্তন যাতে করে জনসাধারণের কানে কাব্যের আবেদন অর্থপূর্ণ হয়। পুরাতন লাতিন ছন্দ কেউ বুঝত না, অন্ততঃ অশিক্ষিতেরা। সমান মাত্রার গোনাগুনতি লাইনের সঙ্গে অন্ত্য মিল যুক্ত হয়ে শব্দের পর শব্দের এমন মালা গাঁথা হল যা মানুষের চেতনা ও স্মৃতি থেকে কোনোদিন মুছে যাওয়ার নয়। (ঘটনাটি যখন ঘটল তখন পুস্তকের প্রচলন হয়নি এবং সমাজের অধিকাংশ লোক পড়তে জানত না।) কাব্যে গীতিকলার উদ্ভব ঘটল এই বিশেষ সামাজিক অবস্থায় কিন্তু তার গুরুত্ব এমনই বেড়ে গেল যে ওই সামাজিক অবস্থার তিরোধানের বহু শতাব্দী পরেও গীতধর্মী কাব্য টিকে রইল। বইয়ের আবিষ্কার ঘটল, একই বই লাখে লাখে ছাপার কৌশল অবলম্বিত হল, কিন্তু গীতিকাব্যের জাদু টিকে রইল।

কিন্তু গানের ছন্দ উপায় হিসেবে বিবেচিত না হয়ে ক্রমশঃই হয়ে পড়ল কবিতা লেখার উদ্দেশ্য। তখন আর তার বিশেষ কোনো তাৎপর্য রইল না। পুনরায় উঠল কবির স্বাধীনতার প্রশ্ন। সুতরাং যখন কবির সনাতন গীতি-ছন্দ বর্জন করে তথাকথিত **Veys libere** বা বাঁধনছেঁড়া মুক্ত ছন্দে কবিতা লিখতে লাগলেন, তখন অবশ্যই তাঁরা শুধুমাত্র নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনার দ্বারাই চালিত হননি। কাব্যের এই রূপগত স্বাধীনতা কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে হয়ে দাঁড়াল কবির স্বাধীনতার উপর নতুন এক শৃঙ্খল। গীতিরূপের পরিহার ব্যাপারটা হয়ে পড়ল কলাকৈবল্যেরই অন্যতর অভিব্যক্তি এবং নিয়মিত ছন্দে কবিতা লেখার অনুমোদন রীতিমতো একটা অত্যাচারে পরিণত হল। ত্রিশ বছর আগে এই সমস্যাটা আমার কাছে প্রথম উপস্থিত হয়: কবিতার প্রকৃত অর্থকে কিভাবে অপরের মনে সঞ্চারিত করা যায়? অপণ্ডিত লোকেরা যাতে আমার কথায় কান দেয় তার জন্য গীতিরূপ অবলম্বন করা উচিত হবে কি? অবশ্য মানি যে, এ বিষয়ে জনমতের একটা প্রকাণ্ড প্রভাব আছে এবং সমালোচক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরাই এই জনমতটি সৃষ্টি করেন। তীরধনুক যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর কিউপিডের নিত্য সঙ্গী, মুক্ত ছন্দের সঙ্গে সমসাময়িক কাব্যের সম্পর্কটাও প্রায় তেমনই। আমি এই সমসাময়িক স্টাইলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমার স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম। গানের মতো করে কবিতা লিখে চললাম, অর্থাৎ কিনা সনাতন ফরাসী কাব্যের কায়দায় অমুক্ত ছন্দে, যাতে করে অপণ্ডিত লোকেরা তার রস উপভোগ করতে পারে।

কিন্তু অন্যান্য স্টাইলেও কবিতা লেখা আমি কোনোদিন বন্ধ করিনি। সম্প্রতি বলা হয়েছে, আমার নানা 'স্ববিরোধ'-এর একটা দৃষ্টান্ত এই যে, আমার মুক্ত ছন্দে লেখা ও অমুক্ত ছন্দে লেখা কবিতার পারস্পরিক অনুপাত ১৯৪৩ সাল থেকে কেবলই বদলাচ্ছে। আমার স্বাধীনতাটা ঠিক এইখানেই যে এসব ব্যাপারে কারুর কাছে জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই—কোনো একটা বিশেষ আঙ্গিকের কাছে আমি দাসখৎ লিখে দিইনি। আঙ্গিক আমার কাছে উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায়মাত্র। আমার শ্রোতা কারা, তাদের শিক্ষাদীক্ষা কি রকম, এবং তাদের কাছে আমি কি বলতে চাই, এই সব বিবেচনার দ্বারাই ঠিক হবে আমার বক্তব্যের গড়নটা কি ধরনের হবে। আসল ব্যাপারটা হল শ্রোতাদের মনোযোগের স্মৃতির নাগাল পাওয়া, এক মাধ্যমে না হয়ে অন্য মাধ্যমে শব্দের পর শব্দকে এমন অবিস্মরণীয়ভাবে গেঁথে দেওয়া যাতে লেখকের চিন্তাধারা মানুষের মনে প্রবেশ

করতে পারে এবং মানুষকে বদলাতে পারে—ঠিক যেমন বিজ্ঞান মানুষের কর্ম-পদ্ধতিকে বদলে দিচ্ছে; ঠিক যেমন শিল্পকলার নিয়মকানুনকে অগ্রাহ্য করে সমাজ বদলে চলেছে।

কাব্যের যে সব বৈপরীত্য দেখা যায় তা উপন্যাস জগতের বৈপরীত্যের চেয়ে কম বিস্ময়কর নয়। যাঁদের মাধ্যমে কাব্যে বিস্তারের প্রবেশ ঘটেছে তাঁরা অনেকেই মোটেই নিজেদের বাস্তববাদী লেখক বলে মনে করেন না। যেমন **Guillaume Apollinaire**। তিনি বিগ্রহবাদী ঐতিহ্যের কবি। অথচ যে-সকল শব্দ কাব্যে এতদিন অপাংক্তেয় ছিল, যেগুলিকে এলুয়ার বলেছেন, 'অকারণে নিষিদ্ধ শব্দ', সেই-সব শব্দকে এই বিগ্রহবাদী কবিই সবচেয়ে অধিক সংখ্যায় কাব্যজগতে চালু করেছেন। তিনিই সমসাময়িক অধুনাতন বিস্তারকর্মের জন্মদাতা। বাঁধের আগল খুলে তিনি জীবনের মুক্তধারা বইয়ে দিলেন কাব্যক্ষেত্রের আনাচে-কানাচে। কথিত ভাষার জগৎ থেকে লিখিত ভাষার জগতে চলাচলের পথটি তিনি উন্মুক্ত করলেন। জীবনের বহু বাস্তব সত্যকে অপরিশুদ্ধ অবস্থায় তিনি কাব্যে এতদিন-কার কায়েমী দরবারে ঢুকতে দিলেন।

এই ধরনের গীতিকাব্যগত বিস্তার ঐকান্তিক উদ্ভাবনপ্রীতি ও সৃজানুরাগ থেকেই জন্মলাভ করেছে। এর সঙ্গে ষ্টিভেনসন কথিত আলোকচিত্রের খুঁটিনাটি তথা প্রাকৃতিকবাদী বর্ণনাবিস্তারের কোনো মিল নেই। আধুনিক সাহিত্যে যে বিস্তারের আবির্ভাব ঘটেছে তা মানুষের বিবেকেরই বাহন। তা আলোকচিত্রের মতে হুবহু অনুলিখন নয়। বরং তা জীবনের পরিবর্তনশীল বস্তুসত্যেরই মুসাবিদা।

তাই বলছিলাম, আধুনিক বাস্তববাদের বহুবিধ উৎস। এক উৎস ও অন্য উৎস অনেক ক্ষেত্রে আপাতবিরোধী। বর্তমান শতাব্দীর শিল্পকলা খুঁটিনাটির দাস নয়। বরং তা অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা খুঁটিনাটিকে কাজে লাগাতে ও শাসন করতে শিখেছে। আজ কেউ যদি প্রাকৃতিকবাদী পর্যবেক্ষক হতে চান তাতে ক্ষতি নেই তবে এই শর্তে যে পর্যবেক্ষণ ব্যাপারটি উদ্দেশ্য না হয়ে উপায় হিসাবেই অবলম্বিত হবে; কিংবা যদি কেউ দাবি করেন যে তিনি আইডিয়ালিস্ট (অবশ্য কথাটার সাহিত্যিক অর্থে), এই দাবিও অগ্রাহ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত ভাষাগত পরীক্ষানিরীক্ষা উদ্দেশ্যস্বরূপ না হয়ে আইডিয়াকে প্রকাশ করার উপায়-স্বরূপ হয়ে থাকে।

প্রায়ই আলোচনা ওঠে এ বিষয়ে যে আজকাল আমরা দেখছি একটা নতুন রকমের রোম্যান্টিকবাদ, না একটা নতুন রকমের চিরায়তবাদ? আমি নিজে এই

উভয়সংকটের মধ্যে আটকে থাকতে রাজী নই। আগামীকালের মানুষ যেমন রোম্যান্টিকবাদ থেকে, তেমনই চিরায়তবাদ থেকে নিজের যা দরকার বেছে নেবেন। মানুষ কাল যে কাজ করেছে আজ তিনি তারই পুনরাবৃত্তি করবেন না। কিন্তু তাঁর পক্ষে অভিজ্ঞতার মূল্যকে এই কারণেই অস্বীকার করা ছেলেমানুষী যে, তা রোম্যান্টিক অথবা চিরায়ত, প্রাকৃতিকবাদী অথবা বিগ্রহবাদী। বাস্তবতার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পূর্বকালীন অভিজ্ঞতাকে যাচাই করার এই নতুন বিচার সূত্রটির মধ্যেই রয়েছে নতুন শিল্পকলা। তাই নতুন শিল্পকলা অবশ্যই নতুন রকমের এক বাস্তববাদ। তা যুগপৎ বৃক্ষ ও অরণ্য উভয়কেই চিত্রিত করে এবং জেনেশুনে বেশ সজ্ঞানেই করে। এই বাস্তববাদ খুব সক্রিয়। শিল্পের জন্যই শিল্প, এমনতরো অহেতুকী শিল্পকলার সঙ্গে তার আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই বাস্তববাদ মানুষকে সাহায্য করে, তাকে পথ চলতে আলো দেখায়, তার অগ্রগতির দিশা নির্ণয় করে এবং সর্বদা তার অভিযানের শীর্ষদেশে অবস্থান করে।

অবশ্য ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, শিল্পীর মনে মানবপ্রগতির স্বরূপ সম্বন্ধে উপলব্ধি বিদ্যমান ; শিল্পী জানেন তাঁর অভিযান কোন্ কোন্ শক্তির দ্বারা ব্যাহত হচ্ছে এবং মানবের বিবর্তন আজ কোন্ নতুন স্তরে উপনীত। আমি জানি একথা শুনে কেউই বিস্মিত হবেন না যে আমার কাছে এবং আরো অসংখ্য লোকের কাছে এই নতুন স্তরটির নাম সমাজতন্ত্র। সুতরাং স্বভাবতই নতুন বাস্তববাদ নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ নামে অভিহিত করেছে। সমাজতন্ত্র কথাটাই হল সমস্ত ব্যাপারটির চাবিকাঠি।

একথা ঠিক যে নতুন শিল্পকলার এই নামকরণ সোভিয়েত ইউনিয়নেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। তারপর আমরা সকলেই নিজ নিজ দেশে নতুন বাস্তববাদের ওই নামটাই গ্রহণ করেছি। কিন্তু এটা কি সত্য নয় যে জার্মান দর্শন ও জার্মান সাহিত্য থেকেই আমরা রোম্যান্টিকবাদের নাম ও সংজ্ঞার্থ গ্রহণ করেছি? প্রতিটি যুগেই মানবিক মননপ্রবাহ যেখানে সম্ভব সেখান থেকেই নিজের ধনরত্ন আহরণ করে এসেছে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ যে অবস্থায় বিকশিত হয়েছে, ফ্রান্সে সে অবস্থা অবিদ্যমান। সবচেয়ে বড় তফাত এব যে, সমাজতন্ত্র যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রযন্ত্র, তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে গোড়া থেকেই শিল্পীর সঙ্গে সমাজের নেতাদের বোঝাপড়াই হয়েছে সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তববাদের ভিত্তি ; কিন্তু ফ্রান্সে বর্তমান সামাজিক অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদবিরোধী শিল্পকলা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

এটাই সোভিয়েত ইউনিয়নে ও ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পার্থক্যের মূল কারণ। এই পার্থক্যকে অস্বীকার করার কোন মানে হয়না। এদেশে এবং ওদেশে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্বন্ধে ধারণার যে বিরোধিতা দেখা যায়, এই পার্থক্যই তার কারণ। কিন্তু তাই বলে সোভিয়েত অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করা উচিত হবে না। বিরাট এক নতুন ধরনের পাঠক সাধারণ সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখা দিয়েছে। সাহিত্য ও শিল্পকলার ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। যে শিল্পী নিজের রচনার প্রভাব ও আয়ু সম্বন্ধে চিন্তিত, তাঁকে এই মূল সত্যটির সঙ্গে মোকাবিলা করতেই হবে।

যাই হোক, সোভিয়েত ইউনিয়নেই বলুন আর অন্যত্রই বলুন, আমি তর্কাতীত সত্য বলে মানতে প্রস্তুত নই যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের কোনো বিশেষ থিসিস প্রমাণিত বলে বিবেচ্য। এক্ষেত্রে এ যুক্তির মূল্য নেই যে সর্বসম্মতিক্রমে কোনো কিছু মেনে নেওয়া হয়েছে বলেই তার প্রমাণত্ব প্রশ্নাতীত। বরং লেনিনের কথাই ঠিক যে শিল্পকলাগত ব্যাপারকে ভোট দেওয়া চলে না। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যেতে পারে যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মতো একটা ধারণার কোনো জাতীয় সীমানা থাকা উচিত নয়। একটা ছাঁচে ফেলে তার সংজ্ঞার্থকে শাশ্বত ও অনমনীয় করে ফেলা উচিত নয়। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দাবি করে যে, রচনাকে প্রতিপদে মূলনীতির দ্বারা যাচাই করতে হবে। শুধু যে নীতির ও ফলাফলের দিক থেকেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পুনঃপরীক্ষা আবশ্যক তাই নয়; বরং আরো বেশী আবশ্যক বাইরেকার, এমনকি, বিরোধী অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে পুনর্বার যাচাই করা। এর ভিতর দিয়েই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সহনীয় হয়ে উঠবে। এটা প্রমাণিত হবে যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ ওই সব অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে ও আলোকিত করতে সক্ষম; তাদের মধ্যে যা মানবপ্রগতির সঙ্গে সমান্তরাল তাকে গ্রহণ করতে ও আত্মস্থ করতে সক্ষম। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে গড়েপিটে কেউ আমাদের হাতে তুলে দেয়নি; আমরা তাকে যা করে তুলব, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ তাই-ই। তার শিকড় রয়েছে আমাদের অতীতের বিশাল ঐতিহ্যে। কেউ কেউ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বলতে এমন জিনিস বোঝেন যার অতীতে কোনো শিকড় থাকবে না; কিন্তু এই শিকড়কে কেটে ফেললে উপরকার ডালপালাও শুকিয়ে যাবে। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পিছনে রয়েছে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা অতীত ঐতিহ্যকে জিইয়ে রাখতে চায় ও

আলোকিত করতে চায় এবং যা নিজেদের অনুচরদের অনুমতি দেয় অতীতের চিন্তাধারা থেকে পুষ্টিগ্রহণ করতে। শুধু ফরমূলা চিবিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বাঁচতে পারে না। তার বৃদ্ধির জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার ও সাহিত্যের বৃদ্ধি এবং প্রসার দরকার। ভিক্টর হুগো তাঁর 'উইলিয়ম শেক্সপীয়র' গ্রন্থের শেষে ইতিহাস সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছিলেন: 'এটা খুব পরিষ্কার যে, ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে হবে; এতদিন শুধু তথ্যের দীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ইতিহাস লেখা হয়েছে; এইবার নীতির দিক থেকে ইতিহাস লেখার সময় এসেছে।'

পুরাতন সমালোচনার সঙ্গে নতুন সমালোচনার সম্পর্ক সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা যায়।

এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে, ঘটনার ও কাজের বাইরে ইতিহাসের কোনো অস্তিত্ব নেই; হুগো তা ভাল করেই জানতেন। কিন্তু এই প্রতিভাশালী লেখক এই সত্যকেই আমাদের কাছে সরলভাবে উপস্থিত করেছেন যে, শুধু তথ্যের স্তূপ রচনা করাটা হবে এক প্রকার ঐতিহাসিক প্রাকৃতিকবাদ; নীতির দিক থেকে তথ্যগুলি চিন্তিত, সংগঠিত ও আলোকিত হওয়া দরকার। আমি অবশ্য ইতিহাসের আলোচনা করছি না। সাহিত্যেরই আলোচনা করছি। তবু দুই ক্ষেত্রে একই সমস্যা; তাই হুগোর বচন উদ্ধৃত করলাম। সমালোচকের কাছে সাহিত্যের গ্রন্থরাজিই সাহিত্যের তথ্য; এবং সময়ে সময়ে নীতির নামে, যেমন ধরুন, সমাজতন্ত্রের নামে যাঁরা তথ্যকে উড়িয়ে দিতে চান তাঁদের বিরুদ্ধে যাওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে যে সমালোচক সমাজতন্ত্রের নীতিতে বিশ্বাস করেন, তাঁর পক্ষে সাহিত্যের তথ্যগুলিকে—অর্থাৎ গ্রন্থগুলিকে—সমাজতন্ত্রের কাঠামোয় ফেলে বিচার করা দরকার। ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জগৎ থেকে এগিয়ে গিয়ে মানবসাধারণের সংগ্রামে অংশগ্রহণের পথে লেখকের অগ্রগতি সমাজতন্ত্রের কর্মসূচীর এক অংশ। এ বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক সমালোচকের হাতে এক মহৎ দায়িত্ব ন্যস্ত, এবং পাঠক হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই এক-একজন সমালোচক—উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণই করি পঠিত পুস্তকটিকে অথবা বর্জনই করি।

একথা বলছি এইজন্য যে যাঁরা বই না পড়ে সমালোচনা করেন তাঁদের চেয়েও সেই সব সমালোচকরা আমার কাছে বেশী সন্দেহভাজন যাঁদের দাবি এমনধারা যে তা কেউ মেটাতে পারে না। এই ধরনের লোক সর্বদাই আমাদের চারপাশে রয়েছেন। যখন তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে সমালোচনা করেন, তখন আমি বেশী চিন্তিত হই না। কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়ি যখন দেখি যে, যিনি

আমাদের ঘরের লোক প্রগতিশীল সমালোচক, তিনিও ক্রমাগত দাবি করছেন যে দৃশ্যপট আরো একটু চড়ানো হোক। কিছুতেই তাঁর কনে পছন্দ হয় না। কবিতা বা উপন্যাস তাঁর চোখে কখনই যথেষ্ট বাস্তববাদী বা যথেষ্ট সমাজতান্ত্রিক বলে মনে হয় না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ এমন উঁচু ডালের ফল নয় যা একেবারে আমাদের নাগালের বাইরে। তা এইখানেই রয়েছে, আমাদেরই মধ্যে। আসল কথা হল, জিনিসটি কি তা জানা এবং তার দেখা পেলে তাকে চিনতে পারা।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা একটু চওড়া রকমের। আমার বিশ্বাস, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের এইভাবে চলা উচিত যাতে অগ্রণী বাহিনীর সঙ্গে জনসাধারণের বিচ্ছেদ না ঘটে; যাতে জাতীয় সাহিত্যের ক্রমান্বয় সংরক্ষিত হয় এবং অন্যান্য প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে তার সম্পর্ক দাক্ষিণ্যযুক্ত হয়। এটা করতে না পারলে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদের দিকে এবং সমাজতন্ত্রের দিকে এগুতে পারবে না; তা হয়ে রইবে একটি সাম্প্রদায়িক, পণ্ডিতী শিল্পকলা এবং বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে তা এমন সাহিত্য ও শিল্পকৃত সৃষ্টি করতে পারবে না যার ধাপ বেয়ে আমরা ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ হতে পারি।

বুঝতে পারছি যে, আমার এইসব কথার এমন ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব যে এতে করে কমিউনিজম সংগ্রাম বলতে যা বোঝে, অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রাম, তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তা একেবারেই অননুমোদনীয়। তাই সবিনয়ে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে **Cahiers du Communisme** পত্রিকায় প্রকাশিত এবং আংশিকভাবে প্রাভদা কাগজে পুনর্মুদ্রিত লরাঁ কাসানোভার একটি লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিই: '....পার্টি একথা জানে যে, ফ্রান্সের মতো দেশে পার্টি যদি প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে একটি অদ্বিতীয় মার্কসীয় ভাবসমষ্টিতে পর্যবসিত করে বা করছে বলে মনে হয়, তাতে বিপদ ঘটবে। তার ফলে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টিক্রিয়তা প্রগতিশীল ভাবজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং যে ভাব বিনিময় পরস্পরের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে, তার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন। অনেক কমরেড অপরের সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপন করতে খুবই রাজী, কিন্তু এই রাজনৈতিক মৈত্রীর কাঠামোর মধ্যে কোনরূপ ভাববিনিময় করতে তাঁরা যেন নারাজ বলে মনে হয়। তাঁরা রাজনীতিকে ভাবাদর্শ থেকে কৃত্রিম উপায়ে আলাদা করে ফেলেন, যেমনটি করেন সুবিধাবাদী অপরাপর উদ্দেশ্যে। পার্টি এটা একটু দেরিতে বুঝতে পেরেছে যে, মার্কস্ যে কাজটি কদাচ

না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে অবিকল সেই কাজটি করাই হয়েছে পার্টির দোষ : অর্থাৎ কিনা সারা জগতের সামনে তত্ত্বাগীশরূপে নিজেদের দাঁড করিয়ে এই বলে চেঁচানো ; 'ইহাই সত্য। বিশ্বজন, নতজানু হও।'

আমি এই প্রবন্ধে যা বলেছি তার সঙ্গে কাসানোভার চিন্তাধারার খুব বেশী অমিল নেই। যে সংগ্রামে আমি বরাবর অংশগ্রহণ করে এসেছি তার স্লোগানটাই আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। কাসানোভার চেয়ে আমি অবশ্য আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে রোম্যান্টিকবাদ সম্বন্ধে আমার ধারণার কথাই পুনর্বার বলব। রোম্যান্টিকবাদের উৎপত্তি ও স্টাইল বিচিত্র। সমসাময়িক ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ গড়ে তোলার ব্যাপারে রোম্যান্টিকবাদকে ব্যবহার করা আবশ্যক। কারা কারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের অধিকারী বলে নিজেদের মনে করে, তাদের একটা তালিকা রচনার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ 'ইউনিয়ন' নয় এবং তাতে আপনার 'যোগদান' অসম্ভব। এই ভুল ধারণাও আপনাকে ছাড়তে হবে যে, কেবল সমাজতান্ত্রিক দেশেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্ভব। তারপর একথাও ঠিক যে, যাঁরা নিজেদের গায়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের টিকিট লাগিয়ে দেন না, যাঁরা এর নিন্দা করেন, তাঁদের রচনাতেও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের মূল জিনিসটি বলতে পারে, যদিও অন্যান্য বিপরীত ধারণার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে।

সুতরাং ব্যাপারটিকে এভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে, আমরা সমাজতন্ত্রের যুগের লেখক একথা জানি বা নাই জানি, আমাদের কাজের স্টাইলটা কি হবে, কিভাবে লিখব, তার নানা পথের বাছবিচার করে যেটিকে চাই সেটিকে বেছে নিতে আমরা অবশ্যই পারি। কিন্তু যে পথই অবলম্বন করি না কেন, যদি লেনিনের এই তত্ত্ব সত্য হয় যে আর্ট জীবনেরই প্রতিফলন—এবং আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ—তাহলে আমাদের ভিতর দিয়ে অবশ্যই আমাদের নিজেদের যুগটাই প্রতিফলিত হচ্ছে। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, কখনো হয়তো বাঁকাচোরা-ভাবে, এমন কি উদ্ভটভাবে, আমাদের লেখার ভিতর দিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে মানবের অভিযানই প্রতিফলিত হচ্ছে। সাহিত্যের অসংখ্য তথ্যকে এবং শিল্পকলার অজস্র খুঁটিনাটিকে ঐক্য ও সংহতি দেওয়ার জন্য যে ধারণার প্রয়োজন তার নাম সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ। এই ধারণার সাহায্যে লেখক নিজের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সীমা অতিক্রম করে শিল্পকলার অফুরন্ত বিস্তারকে ব্যাখ্যা করেন, তাকে তাৎপর্যময় ও শক্তিমান করে তোলেন এবং তাকে মানবের অগ্রগতির

সঙ্গে একীভূত করেন। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের মতো শিল্পকলাও বহু বিচ্ছিন্ন উদ্ভাবনের সমষ্টিমাত্র নয়। অপরে যা উদ্ভাবন করেছেন তার প্রতি আমরা উদাসীন থাকতে পারি না, তাকেও অর্থপূর্ণ করে তোলা আমাদের কর্তব্য। যে-সব বাস্তববাদী এমন এক বাস্তববাদের বড়াই করেন যা বৈজ্ঞানিক এবং যার একটি আভ্যন্তরীণ লজিক আছে, তাঁদের কাজ হল মানবের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করে সমবেতভাবে সাহিত্যের ও শিল্পকলার ক্রমস্বয়ত্তাকে সংগঠিত করা। আমি যদি আমার নিজের লেখা দিয়ে এবং অপরের লেখার প্রতি মনোযোগ দিয়ে এই কাজে সামান্য কিছুও সাহায্য করে থাকি তাহলে বুঝব যে আমি আমার জীবনের ও শক্তির সদ্ব্যবহার করেছি; তাহলে এই চরিতার্থতা বোধ জন্মাবে যে আমার নিজের কাজের ক্ষেত্র দৈবক্রমে একদা যেখানে নিজেকে দেখতে পেয়েছিলাম সেখান থেকে বিশ্বমানবের লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছি। আজকের অর্ধেক বয়সে সেদিন নিজের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে চলার যে সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম তা অপরিবর্তনীয়।

জনপ্রিয়তা ও বাস্তববাদ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

বারটোল্ট ব্রেশ্‌ট

জার্মান সাহিত্যের জন্য আজ (১৯৩৮) কোন স্লোগান তুলে ধরতে হবে, একথা ভাবার সময় মনে রাখা দরকার, সাহিত্য বলে যা কিছু ছাপা হচ্ছে, তা মূলত দেশের বাইরেই হচ্ছে; আর বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া একমাত্র সেইখানেই তা পড়া যাচ্ছে। এর ফলে 'সাহিত্যের জনপ্রিয়করণ' স্লোগানটি বিচিত্রভাবে জট পাকিয়ে আছে।

যে জনগণের জন্য লেখকরা লিখবেন, তাদের মধ্যে না থেকেই এ কাজটা লেখকদের করতে হচ্ছে। একটু খতিয়ে দেখলে অবশ্য বোঝা যাবে, ফারাকটা যত বড় ভাবা হয়, আসলে ততটা নয়। এই ব্যবধানটাকে আবার পুরোপুরি 'বাইরে'র ব্যাপার হিসেবে দেখতে খুবই ভুল অর্থাৎ অবাস্তব হবে। জনপ্রিয় ঢংয়ে লেখবার জন্য আজ বিশেষ প্রচেষ্টা দরকার। আবার একই সঙ্গে কাজটা সহজতর হয়ে এসেছে; সহজ এবং আরো জরুরী। জনগণ পরিষ্কারভাবে তাঁদের উঁচু স্তরটা থেকে আলাদা হয়ে গেছে, নিপীড়নকারী শোষকরা তাদের পরিত্যাগ করেছে এবং জনগণের বিরুদ্ধে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, যা কোনমতেই আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। পক্ষ অবলম্বন করাটা এখন ঢের ঢের সোজা। 'দর্শক-শ্রোতা'রাও আজ একটা প্রকাশ্য যুদ্ধের ভেতর জড়িয়ে পড়েছেন।

বাস্তবধর্মী লেখার দাবিটি আজ আর ডুকথায় এড়িয়ে যাবার নয়। কমবেশি তা প্রকট হয়ে উঠেছে। শাসকশ্রেণীও আগের চেয়ে প্রকাশ্যে ঢের বেশি মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে আর সে সব মিথ্যার বহরও আগের চেয়ে লম্বা। সত্যি কথা

বলাটা আজ ক্রমাগত জরুরী হয়ে পড়ছে। জনগণের দুঃখকষ্ট অবর্ণনীয় আর তাদের সংখ্যাও বেড়েই চলেছে। জনগণের ব্যাপক দুঃখ-যন্ত্রণার সঙ্গে তুলনা করলে নানান ছোটখাটো অসুবিধে আর গোষ্ঠীগত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো নেহাতই মামুলি ঠেকবে।

ক্রমবর্ধমান বর্বরতার বিরুদ্ধে একটিমাত্র মিত্র শক্তিই আছে, তাঁরা হলেন জনগণ—যাদের একটানা দুর্ভোগ সইতে হচ্ছে। একমাত্র জনগণই কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছেন। কাজেই তাঁদের দিকে ঝুঁকে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক। এবং যে কোন সময়ের তুলনায় তাঁদের ভাষায় কথা বলাটা আরো জরুরী হয়ে পড়েছে।

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই 'জনপ্রিয়তা' এবং 'বাস্তবতা' হ'ল পরস্পরের পরিপূরক। জনগণের স্বার্থে, ব্যাপক মেহনতীদের স্বার্থে সাহিত্যের কাজ হবে বিশ্বস্তভাবে জীবনকে তুলে ধরা। ব্যাপক মেহনতীদের কাছে, জনগণের কাছে বিশ্বস্তভাবে জীবনকে তুলে ধরতে হলে, সাহিত্যকে করতে হবে অর্থ ব্যঞ্জনাময় এবং বোধগম্য—অর্থাৎ জনপ্রিয়। আর এসব ধারণা পেশ করার আগে, তাদের ব্যবহার করার আগে, আগাপাস্তলা ঢেলে সাজানো খুবই জরুরী। এটা ভাবলে ভুল হবে যে এইসব ধারণার দ্ব্যর্থহীন, প্রাঞ্জল সব ব্যাখ্যা হয়ে গেছে এবং এদের যেন কোন অতীত ইতিহাস নেই। ('এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে, এতো আমরা সবাই জানি।') জার্মান ভাষায় 'জনপ্রিয়' শব্দটাই তেমন জনপ্রিয় নয়। তাকে জনপ্রিয় ভাবাটাও বাস্তবসম্মত হবে না। '**Tum**' ধ্বনিযুক্ত একগাদা শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে খুবই সতর্ক থাকা দরকার। ভাবুন একবার **Brauchtum, Konigstum, Heligtum** ইত্যাদি বিশেষ শব্দগুলোর আনুষ্ঠানিক, ধর্মীয় আচারমূলক ও দ্ব্যর্থবোধক ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের কি ধরনের সচেতনতা দরকার! আমরা এগুলো উপেক্ষা করতে পারি না, কারণ জনপ্রিয়তার সঠিক ধারণাটি আমাদের পেতেই হবে।

যেমন কাব্য ক'রে বলা হয়, অনেকটা সেভাবেই 'লোক' কথাটি, যা জনগণ শব্দটির চেয়ে লৌকিক, নিতান্তই সংস্কারাচ্ছন্ন ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে; কিংবা যা নিজেই রীতিমতো সংস্কারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে লোক বা জনসাধারণ তাদের অসংখ্য ছোটখাটো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যুগযুগান্তের সম্মানিত ঐতিহ্য, শিল্পকলার রূপ, প্রথা এবং অভ্যাস, ধর্মীয় আচ্ছন্নতা এবং বংশানুক্রমিক শত্রু, তাঁদের অপরাজেয় শক্তি এবং আরো সব কিছু পাশাপাশি নিয়েই হাজির

হয়। ফলে, অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত, শোষক ও শোষিত, মিথ্যুক আর তাঁর শিকারের মধ্যে ধারণাটি বিচিত্রভাবে তালগোল পাকিয়ে আছে; লোক বলতে শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অগণিত 'সাধারণ' শ্রমজীবী মানুষই বোঝায় না।

'জনপ্রিয়' কথাটার ধারণা যেভাবে যুগে যুগে বিকৃত করা হয়েছে, তার সুদীর্ঘ জটিল কাহিনী হ'ল শ্রেণীযুদ্ধ ইতিহাসের অঙ্গ। আমরা এ নিয়ে বাগবিস্তার করতে চাই না; কিন্তু জনপ্রিয় শিল্পসৃষ্টি অর্থাৎ ব্যাপক জনসাধারণের জন্য শিল্প, সংখ্যালঘুর হাতে নিষ্পেষিত সংখ্যাগুরু মানুষের জন্য, প্রকৃত জনগণের জন্য, উৎপাদকদের জন্য—যারা এ যাবৎ রাজনীতির বাইরের ব্যাপার হিসেবেই থেকেছে, তারাই এখন মুখ্য হয়ে উঠতে চাইছে—এ নিয়ে ভাবার সময় আমাদের অবশ্যই ওই সব জালিয়াতির কথা মাথায় রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতেই হবে, যে সব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান 'লোক' বা জনগণের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে দেয় নি, তারাই কৃত্রিমভাবে অথবা গায়ের জোরে তাদের ওপর বহুবিধ সংস্কার চাপিয়ে দিয়েছে এবং জনপ্রিতার ধারণাটিকে তার পটভূমি এবং বিকাশের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অনড়, অচল বলে ঘোষণা করেছে। এই সব ধারণার সঙ্গে আমাদের কোন সংযোগ নেই—বরং তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়তে হবে। আমাদের জনপ্রিয়তার ধারণা গড়ে উঠেছে সেই সব জনগণকে ঘিরে যারা শুধু বিকাশের প্রক্রিয়ায় পুরোদস্তুর যুক্তই নন, যারা তার দায় তুলে নিয়েছেন, চাপ সৃষ্টি করছেন এবং তা নির্ধারণ করছেন। যে জনগণের কথা আমরা ভাবছি, তারা ইতিহাসের নির্মাতা, তারা দুনিয়াকে এবং নিজেদেরকে বদলাচ্ছেন। আমাদের চোখের সামনে রয়েছে সংগ্রামরত জনগণ—আর 'জনপ্রিয়তার' একটি লড়াকু ধারণা।

জনপ্রিয় মানে হ'ল ব্যাপক জনগণের কাছে বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তোলা; জনগণের নিজস্ব প্রকাশ রীতিকে গ্রহণ করা এবং তাকে আরো উন্নত করা; জনগণের দৃষ্টিকোণ বেছে নেওয়া এবং তা সুদৃঢ় করা—এমন ভাবে জনগণের এগিয়ে থাকা অংশের প্রতিনিধিত্ব করা যাতে তারা নেতৃত্বের জায়গা নিতে পারে; এর ফলে তা সমাজের অন্যান্য অংশের কাছেও বোধগম্য হবে। উত্তরাধিকারের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বর্তমানে যারা এগিয়ে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের কার্যকলাপের ফলাফল সংগ্রামরত জনগণের হাতে তুলে দেওয়া, যাতে তারাও এগিয়ে যায়।

এবার আমরা 'বাস্তববাদ' এই ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করবো। এটা একটা বহু পুরোনো ধারণা—নানান মানুষ বহুবিধ উদ্দেশ্যে তার ব্যবহার করেছে; কাজেই তা ব্যবহার করার আগে, আমাদের কাজ ধারণাটা পরিষ্কার করে নেওয়া। এটা জরুরী, কেননা জনগণ যখন কোন উত্তরাধিকার গ্রহণ করে, তার ভেতর শোষণের একটা প্রক্রিয়া থেকেই যায়। কলকারখানার মত সাহিত্য শিল্পের অধিগ্রহণ সম্ভব নয়; সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রেও শ্রমশিল্প সম্পর্কিত আইন-কানুন খাটে না। বাস্তবধর্মী রচনা, ইতিহাসে যার বহু উদাহরণ ছড়ানো, স্বাভাবিকভাবেই তা শর্তবদ্ধ। কিভাবে, কখন, কোন শ্রেণীর জন্যে তা কাজে লাগানো হয়েছে, তার ছোটখাটো সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শর্তাধীন। আমাদের ধারণায় রয়েছে সংগ্রামী জনগণ—যারা বাস্তব পৃথিবীকে বদলে দিচ্ছে; কাজেই 'বহু পরীক্ষিত' গল্প বলার রীতি সাহিত্যের ইতিহাসে যে সব মূল্যবান আদর্শ (মডেল) সৃষ্টি করেছে, তাকেই আঁকড়ে ধরতে হবে, বা চিরায়ত নন্দন-তত্ত্বকে মেনে চলতে হবে, তার কোন মানে নেই। কয়েকটি নির্দিষ্ট সাহিত্যকর্মের কোন বিশেষ বা একমাত্র বাস্তবতার ভিত্তিতে আমরা কোন বিমূর্ত ধারণা গড়বো না। বরং নতুন-পুরোনো, ব্যবহৃত-অব্যবহৃত সব ধরনের উপায়কেই জীবন্তভাবে ব্যবহার করবো। শিল্পকলা এবং শিল্পকলার বাইরের উৎস থেকেও যাতে জীবন্ত বাস্তবকে সদাজাগ্রত জনগণের হাতে তুলে দেওয়া যায়—এবং তারা তা আয়ত্ত করতে পারেন।

বালজাক বা টলস্টয়ের উদাহরণ দিয়ে কোন বিশেষ যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসের রূপ-কে আমরা বাস্তববাদ বলে হাজির করবো না, যাতে নিছক আনুষ্ঠানিক আর সাহিত্যিক মাপকাঠিতে তার বিচার হয়। বাস্তববাদের কথা বলতে গিয়ে আমরা শুধু যা কিছু গন্ধ, স্পর্শ বা দৃষ্টিগ্রাহ্য ততটুকুই দেখবো না; কিংবা এমনভাবে পরিবেশ গড়া, গল্প এমন কায়দায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাতে মনস্তাত্ত্বিকভাবে চরিত্রগুলো নিরাভরণ রূপে দেখানো যায়—তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবো না। আমাদের বাস্তববাদের ধারণা হওয়া চাই আরো ব্যাপক এবং রাজনৈতিক—নান্দনিক বিধিনিষেধ আর প্রথাবদ্ধতার থেকে সর্বাংশে মুক্ত। বাস্তববাদ * মানে: সমাজের হেতুবাদী জালকে খুলে ধরা, আধিপত্যে স্থিত দৃষ্টিভঙ্গীকে শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে দেখানো। সেই শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী থেকে

* জর্জ লুকাচ বাস্তববাদ প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে আলোকপাত করেছেন—যদিও আমার বিবেচনায় সে সব সংজ্ঞাও বেশ সংকীর্ণতাদুষ্ট।

লেখা, যে শ্রেণী মানবসমাজের ক্রমবর্ধমান সমস্তাগুলির ফয়সালার জন্ম ব্যাপক সমাধান তৈরী করেছে। বিকাশের গতিময়তার ওপর তা জোর দেবে। বাস্তববাদ হবে মূর্ত, আর বিমূর্ততাকেও তা উৎসাহিত করবে।

বেশ লম্বা ফরমান, ইচ্ছে করলে একে আরো লম্বা করা যায়। আমরা চাই শিল্পীরা তাঁদের সমস্ত কল্পনাশক্তি, সমস্ত নিজস্বতা, রসবোধ এবং সৃষ্টিক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করুক। আমরা কোনক্রমেই অকারণে পুঙ্খানুপুঙ্খ সাহিত্যিক মডেলে লেখকদের আটকে রাখবো না বা তাঁদের অতিসংক্ষিপ্ত গল্প বলার রীতিতে বাধ্য করবো না।

আমরা তথাকথিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লেখাকে (যা ধরা-ছোঁয়া যায়) স্বতস্ফূর্তভাবে বাস্তববাদী রচনার সঙ্গে এক ক'রে দেখবো না। কারণ, দেখা যাবে এমন অনেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রচনা আছে যা মোটেই বাস্তববাদী নয়, আবার এমনও বাস্তববাদী লেখা আছে, যা ঠিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে রচিত হয়নি। ঘটনাবিন্যাসের ভেতর দিয়ে চরিত্রের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণই গল্প বলার সেরা পদ্ধতি কিনা তা সর্তকতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের পাঠকরা সংগতভাবেই ভাবতে পারেন, বইয়ের নায়কের অন্তর্জগতের অনুভূতিকে এমন শিল্পরীতিতে পেশ করা হয়েছে, যার ভেতরে ঢোকার চাবিটিই তাদের দেওয়া হয়নি। যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ ছাড়াই যদি বালজাক বা টলষ্টয়ের আঙ্গিক গ্রহণ করি, তাতে হয়তো আমরা আমাদের পাঠকদের এবং জনগণকে ক্লান্তই করে তুলবো—ওই লেখকরা যা প্রায়শঃই করে গেছেন। বাস্তববাদ নিছক রূপরীতির প্রশ্ন নয়। ওইসব বাস্তববাদী লেখকদের নকল করতে গিয়ে, আমরা নিজেরাই আর বাস্তববাদী থাকতে পারি না।

সময় এগিয়ে চলে, নইলে যাদের বরাতে সোনার টেবিল জোটেনি— তাদের খুবই নিঃস্ব ঠেকতো। প্রথা জীর্ণ হয়—উদ্দীপনাও নিভে আসে। নতুন নতুন সমস্যা এসে হাজির হয় আর তা দাবি করে নতুন টেকনিক।

বাস্তবতা বদলে যায়। তার প্রতিনিধিত্ব করতে হলে প্রতিনিধিত্বের উপায়ও বদলাবেই। কিছুই স্বয়ম্ভু নয়। পুরোনোর ভেতর থেকেই নতুনের জন্ম, কিন্তু সেটাই আবার তাকে নতুনত্ব এনে দিয়েছে।

শোষকরা সব সময় একই মুখোস পরে থাকে না। সব সময় ঠিক একই ভাবে মুখোস খোলাও যায় না। সত্যকে বিভ্রান্ত করার জন্যে রকমারি ছলচাতুরির কোন অভাব নেই। ওদের সামরিক সড়কগুলোকে ওরা

বলে 'মোটর রোড'। ওদের ট্যাঙ্কগুলো এমন ভাবে রং-করা যেন বা ম্যাকডাফের ঝোপ। কড়াপড়া হাত দেখিয়ে ওদের দালালরা এমন একখানা ভাব দেখায়, যেন তারাও শ্রমিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, শিকারীদের শিকারে পরিণত করতে হলে রীতিমতো উদ্ভাবনীশক্তির প্রয়োজন। কাল যা জনপ্রিয় ছিল আজ আর তা থাকছে না; তেমনি গতকালের জনগণ আর আজকের জনগণও এক নয়। প্রচলিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত যে কেউ জানেন সত্যকে অবদমিত করার যেমন নানান উপায় থাকছে—তেমনি সত্যকে তুলে ধরারও বহুবিধ কৌশল আছে। অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধ-ঘৃণা উসকে দেবার অনেক পন্থা আছে। সরাসরি করুণ ঘটনাবিবরণীর ভেতর দিয়ে কিংবা খুব সাদামাটা ঢংয়ে গল্প বলে, নীতিকথা বলে, কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভেতর দিয়ে, কখনো বা খুব চড়া সুরে বিবৃতি দিয়ে, কখনো বা গলা নামিয়ে। থিয়েটারে বাস্তবতাকে খুব বাস্তবিক ভাবেও তুলে ধরা যেতে পারে, আবার অবাস্তব, অদ্ভুত ঢংয়েও হতে পারে। মেক-আপ ছাড়াই (কিংবা খুব সামান্য মেক-আপে) অভিনেতাদের খুব 'স্বাভাবিক' দেখাতে পারে—তা সত্ত্বেও সব ব্যাপারটা স্রেফ ধোঁকাবাজীও হতে পারে। আবার কিম্ভূত, বিশাল বিশাল মুখোস পরেও অভিনেতারা সত্যকে তুলে ধরতে পারেন। এ নিয়ে বিশদ যুক্তিতর্কের দরকার নেই, লক্ষ্যপূরণের জন্যই উপায়কে ব্যবহার করতে হবে। আর জনগণ জানেন, কিভাবে তা চাইতে হয়। থিয়েটারে পিসকাটোরের মহান পরীক্ষা-নিরীক্ষা (এবং আমার), যা গতানুগতিক রূপরীতির বিরুদ্ধে কামান দেগেছে, প্রধানত শ্রমিক শ্রেণীর এগিয়ে থাকা ক্যাডারদের কাছ থেকেই তা সমর্থন আদায় করেছে। শ্রমিকরা সব কিছু যাচাই করে তার ভেতরকার সত্যের পরিমাপে। সত্যকে তুলে ধরার জন্য, সমাজের গতিপ্রকৃতির জাল-জট খুলে ধরার জন্য—যে কোন অভিনবত্বকে তারা সাদরে গ্রহণ করেছে। যা কিছু তাদের মনে হয়েছে 'অ্যাক্টো করা', নিছক লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন—তারা তা বাতিল করেছে। শ্রমিকরা কখনই থিয়েটারী বা সাহিত্যিক যুক্তি দিতেন না। 'সিনেমা আর থিয়েটার ঠিক খাপ খায় না' এ ধরনের কোন কথাই তারা তুলতেন না। ফিল্মের অংশবিশেষ ঠিকমত ব্যবহৃত না হলে, তারা বড়জোর বলতেন: 'ফিল্মের ব্যাপারটার কোন দরকার ছিল না।' শ্রমিকদের কোরাস জটিল ছন্দোবদ্ধ কবিতার অংশ বিশেষ (If it rhymed it'd all slip down like butter and nothing would

stick) আবৃত্তি করেছে, তারা আইসলারের দুরূহ (অনভ্যস্ত) গান ((It's got some gut's in it) গেয়েছে। কিন্তু যেসব লাইনের মানে ভুল ছিল, বা তোলা খুব শক্ত—তা আমাদের বদলাতে হয়েছে। চলতি সহজ তাল লয়ের রণসংগীতের (Marching Song) ভেতর কখনো কখনো সূক্ষ্মতা বা চাতুর্য (অপ্রচলিত চাল, জটিলতা) মিলিয়ে দেওয়া হ'ত, তারা বলত : 'বা চমৎকার, এর ভেতর বেশ একটা দোলা আছে।' বাতিল, মামুলি, অতিসাধারণ (There's nothing in it) যা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই, তেমন সব কিছুই শ্রমিকদের কাছে অপ্রয়োজনীয়। যদি কোন নন্দনতত্ত্বের দরকার থেকে থাকে, তাহলে তা এটাই। আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না, একজন শ্রমিক একবার সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ে লেখা একটা গানে এক স্তবক বাড়তি জুড়ে দিতে বলছিল। আমি তাকে বললাম এতে গানের শিল্পগুণ নষ্ট হবে ; সে শুধু মুখ ঘুরিয়ে হেসেছিল। আর তার সেই নম্র হাসিতে নন্দনতত্ত্বের একটা গোটা অধ্যায় যেন স্রেফ ধ্বসে গেল। শ্রমিকরা আমাদের শেখাতে ভয় পেতেন না, তারা শিখতেও পেছপা ছিলেন না।

অভিজ্ঞতা থেকে একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি বাস্তবতার থেকে সরে না গেলে বলিষ্ঠ, অনভ্যস্ত রূপরীতি সর্বহারার সামনে তুলে ধরতে ভয় পাবার কিছু নেই। সব সময়েই কিছু-না কিছু শিক্ষিত শিল্পবোদ্ধা লোক পাওয়া যাবে যাঁরা বলে থাকেন, 'এসব জনগণ বুঝবে না।' কিন্তু জনগণ অসহিষ্ণুভাবে তাঁদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শিল্পীর সঙ্গে সরাসরি বোঝাপড়ায় আসছে। সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠী সৃজনের উদ্দেশ্যে রচিত উচ্চমান সম্পন্ন ঢের সংস্কৃতি আছে—সেই পুরোনো টুপির দু-হাজার রকমফের ; অথবা খুব খানদানি কিন্তু এখন একেবারেই পচা এক টুকরো মাংসকে মোগলাই মশলা দিয়ে রান্না করার মত। সর্বহারা কিছুটা সহজাত বোধ থেকেই অবিশ্বাসের সঙ্গে তা প্রত্যাখান করেন। (তাদের আরো ঢের কিছু নিয়ে ভাববার আছে।) মশলাটা তারা বরবাদ করতে চাইছেন না, তাঁরা মাংসটা বাদ দেবার পক্ষে। দু'হাজারতম রূপের তাঁরা বিরোধী নন, তাঁরা বিরোধিতা করেছেন পুরোনো টুপিটার। যখন তাঁরা নিজেরাই কিছু লেখেন বা অভিনয় করেন, তার মৌলিকতা দেখার মতো। 'অ্যাজিটপ্রপ' শিল্প বলে যা পরিচিত—যা দেখে দ্বিতীয় সারির অনেকে নাক সিটকোবেন—সেটা আসলে দারুণ শৈল্পিক টেকনিক আর প্রকাশভঙ্গীর খনি। সত্যিকারের জনপ্রিয় শিল্পকলার বিকাশের যুগের বিস্মৃত,

জবরদস্ত সব উপাদানকে তারা কাজে লাগিয়েছে, সাহসের সঙ্গে তাকে নতুন সামাজিক লক্ষ্যপূরণের জন্য রূপান্তরিত করেছে। দুঃসাহসিক ছেদ (cuts) এবং কম্পোজিশন, সুন্দর সহজ সরলীকরণ (সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভুল ধারণাও) আর সব কিছু মিলিয়ে এক আশ্চর্য মিতব্যয়িতা। এবং কমনীয়তা, আর জটিলতার এক সাহসিক উপলব্ধি। এর অনেক কিছু আদিম ধরনের মনে হতে পারে, কিন্তু যে ধরনের আদিমতা বুর্জোয়া শিল্পের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিচ্ছবির ভেতর জড়িয়ে আছে—আর যাই হোক এগুলো তেমন ধাঁচের আদিম নয়। যে ধরনের প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে ভাবসম্পদকে ব্যক্ত ও বিমূর্ততাকে উৎসাহিত করা হতো (এবং প্রায়শঃই সফলতার সঙ্গে) কয়েকটি ভুল স্টাইলাইজেশনের অজুহাত দেখিয়ে তাকে বাতিল করা খুবই ভুল হবে। সর্বহারার শাণিত চোখে স্থাচারালিজমের ভাসা ভাসা বাস্তবতা ধরে পড়ে গিয়েছে। Fuhrmann Henschel দেখে তারা যখন বলে, 'আমরা যা জানতে চাই, তার থেকে ঢের বাড়তি বলা হয়েছে'—তার মানে হ'ল, আসলে চারপাশের আপাত বাস্তবতার ভেতরে ভেতরে যে সামাজিক শক্তি কাজ করছে তার আরো বিশ্বস্ত প্রতিনিধিত্ব দাবি করছে তারা। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি 'থ্রি পেনি অপেরা'র আপাত অবাস্তব দৃশ্যসজ্জা কিংবা বিচিত্র পোষাক-আষাক নিয়ে তারা কোন প্রশ্ন তোলেনি। তারা মোটেই সংকীর্ণমনা ছিলনা, বরং সংকীর্ণতাকে (যদিও তাদের বাসস্থান খুবই সংকীর্ণ) তারা ঘৃণা করতো। তারা ছিল দরাজ—আর তাদের মালিকরা হ'ল কঞ্জুস। শিল্পীরা যা একান্ত প্রয়োজনীয় উপলব্ধি করতো, তারা মনে করতো তার থেকে কিছু কাটছাঁট করা যেতে পারে—কিন্তু সাধারণভাবে এ ব্যাপারে তারা ছিলো খুবই অমায়িক। বাহুল্য বা আধিক্যের তারা মোটেই বিরোধী ছিলো না; কিন্তু তারা ওপর-চালাকদের বরদাস্ত করতো না। বলদের মুখে ঠুলি না বাঁধলেও সেটা যাতে ঠিকঠাক মাড়াই করে, সেদিকে তাদের নজর ছিল। 'শিল্পকলার চিরায়ত পদ্ধতিতে' তাদের কোন আস্থা ছিল না। লক্ষ্যপূরণের জন্যে যে নানান রকম পদ্ধতি চাই, তা তারা ভালোই বুঝতো। যদি নন্দনতত্ত্বের কথা ওঠে তো এটাই নন্দনতত্ত্ব।

কাজেই জনপ্রিয়তা এবং বাস্তববাদের মাপকাঠি নির্ধারণে আমাদের যে শুধু যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, তাই নয়—খোলা মনেরও খুব দরকার। সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে তেমন জনপ্রিয়, বাস্তববাদী শিল্পকর্মের নিদর্শন থেকে, সিদ্ধান্তে আসা কোনমতেই উচিত হবে না। এভাবে

দেখলে আখেরে তা নিছক আনুষ্ঠানিক মাপকাঠিতে দেখা হবে, ফলে জনপ্রিয়তা এবং বাস্তববাদের প্রশ্নটি একান্তভাবে আঙ্গিক নির্ভর হয়ে পড়বে।

কোন শিল্পকর্ম বাস্তবধর্মী কী না, প্রচলিত-স্বীকৃত বাস্তবধর্মী সৃষ্টির সঙ্গে (তাদের সময়ে যা অবশ্যই বাস্তববাদী) তার কতটা মিল আছে না আছে তা দিয়ে কেউ নির্ধারণ করতে পারে না। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে জীবনের যে ছবি আঁকা হয়েছে, তার সঙ্গে অন্য ছবির নয়—প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছবিটিকে মিলিয়ে দেখতে হবে। জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রেও একগাছা অনুষ্ঠানিক রীতি পদ্ধতির বিরুদ্ধে সজাগ থাকতেই হবে। আর একটি জনপ্রিয় সৃষ্টির ঢংয়ে লিখলেই যে কারো লেখা জনগণের কাছে বুদ্ধিগ্রাহ্য হবে—তা সুনিশ্চিত নয়। কারণ, ওই সব লেখালিখিও ঠিক তাদের পূর্বদৃষ্টান্তের হুবহু অনুকরণে রচিত নয়। তাদের বোঝাবুঝির জন্যেও অনেক কিছু করতে হয়েছে। এভাবেই আমাদেরও নতুন সৃষ্টির মর্মে পৌঁছোতে ঢের কিছু করতে হবে। যা ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় তার পাশাপাশি যা জনপ্রিয় হচ্ছে, তারও অস্তিত্ব রয়েছে।

আমরা যদি সত্যই জনপ্রিয় সাহিত্য চাই, যা সজীব এবং সংগ্রামী, যা বাস্তবের কঠিন পরিখায় ঘেরা আর বাস্তবকে পুরোপুরি শক্ত মুঠিতে ধরে রয়েছে, তাহলে আমাদের অবশ্যই দৃঢ়তার সাথে বাস্তবের নির্বাধ অগ্রগতির তালে পা মিলিয়ে চলতে হবে। বিপুল মেহনতী জনগণ এগিয়ে চলেছে। তাদের শত্রুদের কার্যকলাপ এবং নৃশংসতাই তার প্রমাণ।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা—শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

কন্‌স্তান্তিন ফেদিন

কোন লেখক যখন (ঈশ্বর না করুন) তাঁর রচনায় কোন কিছুই বাদ রাখতে চান না, তখন তাঁর কলম থেকে খুব সামান্যই ভালো লেখা বেরোয়। এমন কি, একটা বিরাট গ্রন্থে অতি বাজে লেখকও সব কথা বলে উঠতে পারেন না। অপরদিকে, প্রত্যেক সৎ সমালোচক জানেন যে-কোনও গ্রন্থে কোন বিষয়ে কম গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে অথবা আদৌ গুরুত্ব না দেওয়া হতে পারে। তাই বলে কেবল তার ভিত্তিতে ঐ গ্রন্থের বিচার করা হলে তা হবে রীতিমত অন্যায়। তাই সমগ্র শিল্পজগৎকে কোন্ সমস্যা গভীরভাবে আলোড়িত করেছে, তার মধ্যে আমার মতে কোন্‌টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমাকে এখানে সেই প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে।

আমি নিজে এর একটা সাধারণ উত্তর দিয়েছি : সোভিয়েত শিল্পকলার সার্থক বিকাশের জন্য অনতিবিলম্বে অবিরাম মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃতপক্ষে আমি এর চেয়ে অল্পকথায় কিছু বলতে পারিনি। প্রথমে আমি বিষয়টাকে ভেঙে ভেঙে দেখতে শুরু করলাম। আজকের দিনে আমার কাছে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে আমি সেখানটাতেই থমকে দাঁড়ালাম। সে বিষয়টা হচ্ছে পাশ্চাত্যের আধুনিকতার সঙ্গে আমাদের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতিতে সংঘাত। তাই আমি এই বিষয়টা নিয়েই দু'চার কথা বলব বলে স্থির করেছি। যখন আমরা শিল্পের কথা বলি, তখন

আমার মনে হয় সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, সঙ্গীত অথবা মঞ্চের কথা মাথায় থাকে। অবশ্য আমি মূলতঃ সাহিত্যের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই বলতে চাই।

সোভিয়েত সাহিত্যের সঙ্গে পশ্চিমী আধুনিকদের সংঘাত এই প্রথম নয়। সেদিন বহুকাল হয় গত হয়েছে যখন তাঁরা আমাদের দেশে কোন রকম সাহিত্যের অস্তিত্ব আছে বলেই স্বীকার করতেন না। আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে তাঁরা আমাদের লেখদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এর ফল হচ্ছে উল্টো। তাঁরা আসলে বিদেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত শিল্পকলার ক্রমবর্ধমান তাৎপর্যই তুলে ধরেছেন। পশ্চিমী আধুনিক সমালোচকরা সোভিয়েত শিল্পকলাকে আক্রমণ করছেন। মূলতঃ একটা নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তাঁরা এই আক্রমণ করছেন। সাহিত্যের যে-কোন বিষয়ই তাঁদের উপকরণ। সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, তার বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, কখনও কখনও এমন কি আমাদের ভাষার ব্যবহার—এর মধ্যে যে-কোনটাই তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন। সোভিয়েত শিল্পের অনেক বিষয়েই সমালোচকেরা হাত দেন। কিন্তু তাঁদের সবচেয়ে বেশি রাগ আর অসন্তোষ সোভিয়েত লেখক এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র নিয়ে। তাঁদের মতে, পার্টির দ্বারা সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ সম্ভাবনাটি মেনে নেওয়া যায় না। পশ্চিমী সমালোচকের আদর্শ শিল্পী-সত্তা বলতে বোঝান, রাজনীতির উর্ধ্বে অবস্থান। আর স্বভাবতই তাঁরা মনে করেন যে এই আদর্শগত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সোভিয়েত শিল্পকে আক্রমণ করতে হবে। কারণ তা পার্টির প্রতি অনুরক্ত।

এর মধ্যে বেশ কিছুটা শঠতা রয়েছে। কিছু ভুল বোঝাবুঝি থাকাও অসম্ভব নয়।

উদাহরণ স্বরূপ, সোভিয়েতের শিল্প-সাহিত্যে 'নব-সৃজনতত্ত্ব' সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্য দেশগুলি যে হৈ চৈ শুধু করেছে তা শঠতাপূর্ণ কার্যকলাপ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, এই অভিধাটি জনপ্রিয়তা আকুলদের প্রলুব্ধ করার অন্যতম হাতিয়ার। এর ফলে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দু-তিন জন তরুণ কৃতি-কবি প্রবঞ্চিত হয়েছেন। অবশ্য অভিধাগুলি উদ্ভব হয়, আবার বিলীনও হয়ে যায়। 'নব-সৃজনতত্ত্ব' পশ্চিমী সভ্যতার ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবেই রয়ে গেছে। অপরদিকে, সোভিয়েত সাহিত্য তার স্বকীয়তায় স্থির আছে।

আমার মনে হয় যে, পশ্চিমী দেশের সঙ্গে আমাদের শিল্পচেতনার একটা সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু তা ঘটছে কি ভাবে? শিল্পজগতে অনেক ঘটনা ঘটে যার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। প্রচারকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটান। এর ফলেই সম্ভবতঃ তাঁদের জ্ঞানের এই স্বল্পতা দেখা দেয়। কিন্তু তাঁদের শিল্প-আঙ্গিকের ক্রমবিকাশের একটি প্রিয় তত্ত্ব আছে। তাকে বিশ্বের প্রায় সব দেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য কোন কোন পশ্চিমী শিল্পের প্রবক্তা নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালাচ্ছেন। এ সম্পর্কে ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক জাতীয় শিল্পকেই অনুন্নত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য, যদি তা শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক পশ্চিমী ফ্যাশন অনুকরণ না করে। কিন্তু কেউ কি এরকম প্রত্যাশা করবে যে এখন উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য যে দেশগুলি লড়াই করছে, সেই দেশগুলিতে অনিবার্যভাবেই শিল্প একইভাবে বিকশিত হবে, যেমনটি হয়েছিল পুঁজিবাদের আমলে? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে পশ্চিমী শিল্পীরা যেখানে তাদের পুরানো জগৎটাকে পরিত্যাগ করেছে, সেখানে তাদের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি সমাজতান্ত্রিক শিল্প অনুসরণ করবে? জনগণের ইতিহাসই তাদের শিল্পীদের জন্য নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট পথ নির্ধারণ করে দেয়।

সোভিয়েত শিল্প গ্রন্থকীটের পড়ার ঘর থেকে জন্মায়নি, সন্ন্যাসীর আশ্রম থেকেও না। গৃহযুদ্ধের কঠিন দিনগুলিতে এই বর্ষীয়ান রুশ লেখকরা এখনকার চেয়ে অনেক তরুণ ছিলেন। তখন তাঁদের পছন্দের একটাই বিষয় ছিল, —ব্যারিকেডের কোন্ পাশে তাঁরা দাঁড়াবেন। এবং তাঁরা পথ বেছে নিয়েছিলেন। যদি তাঁরা কোন ভুল সিদ্ধান্ত করতেন, সেটা সংশোধনের মত যথেষ্ট ক্ষমতাও তাঁদের ছিল। প্রখ্যাত সোভিয়েত লেখক আলেক্সি তলস্তয় তাঁর গল্পগুলিতে এইসব যন্ত্রণাদায়ক অনুসন্ধানের তীব্র এবং চাঞ্চল্যকর চিত্র আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তিনিই সেই লেখক, যিনি বিশের দশকের গোড়ার দিকে নবীন পাঠকদের কাছে এক মন্ত্র শুনিয়েছিলেন: 'নতুন পাঠক হচ্ছে সেই, গ্রাম এবং শহরের উপর প্রভুত্ব করার জন্য যার নিজস্ব উপলব্ধি হয়েছে এবং যে গত দশ বছরে দশবার জীবন ফিরে পেয়েছে, বাঁচার জন্য যার ইচ্ছা এবং সাহস দুটোই আছে।' তলস্তয় জোর দিয়ে বলেছিলেন যে লেখক হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পাঠকের ডাক শুনতে পান, 'তোমরা চাও আমি শিল্পের যাদু-দণ্ডটি হাতে তুলে নিই।....তাহলে লিখতে পারবো সৎভাবে, স্পষ্টভাবে, সরলভাবে, মর্যাদাপূর্ণভাবে। শিল্পই আমার আনন্দ।'

অবশ্য কেবলমাত্র আলেক্সেই তলস্তয়ই এই ডাক শোনেননি। কুপরিনও মারাত্মক ত্রুটির কবলে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন এবং পশ্চিম থেকে স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন। বৃদ্ধবয়সে বুনিন বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর স্বদেশ ত্যাগের শোচনীয় পরিণতি। সুদূর প্রবাস থেকে তিনি সোভিয়েতের তরুণ লেখকদের মর্মস্পর্শী চিঠি লিখতেন এবং তাদের উৎসর্গ করে গ্রন্থ প্রকাশ করে পাঠাতেন।

সব অভিজ্ঞতাই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের যোগফল। বয়স্ক লেখকদের দুর্ভাগ্য এবং তাঁদের শোচনীয় পরিণতি সোভিয়েত লেখকদের কাছে এক শিক্ষা। যেমন বিপ্লবী জনগণের টগবগে অবস্থা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাই ছিল সকল ঐতিহাসিক শিক্ষার মধ্যে সেরা। তাঁরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এক নূতন জগৎ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁরা 'অক্টোবরের দেশকে' রক্ষা করেছিলেন এবং মহান এক দেশপ্রেমিক যুদ্ধে জয়লাভের লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা আমাদের সেরা মানুষগুলির রক্তে-ভেজা পথে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে আমাদের সাহিত্য ছিল সোভিয়েতের ইতিহাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। তাই সোভিয়েত জনগণের ইচ্ছা যে প্রতিটি পদক্ষেপে কমিউনিষ্ট পার্টিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে এই ইতিহাস লিখিত হবে।

সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্য এবং পার্টির মধ্যে সংঘাতের বীজ বপন করে কমিউনিষ্ট-বিদ্বেষীরা কোন্ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে চায়? ইতিহাসের চাকা উল্টোদিকে ঘোরে না। এটা সত্য যে পশ্চিমী প্রচারকেরা এত বোকা নয় যে তারা আমাদের শিল্পীদের সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলবে। এই পদ্ধতি কার্যতঃ আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলেই বিবেচিত হবে। পশ্চিমী সমালোচনার সবচেয়ে প্রিয় অংশ হল, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। কারণ, তার অন্যতম উপকরণ, অতীত সম্পর্কে ধারণা ও ঐতিহ্যের সমস্যা।

সুস্পষ্টভাবে, সোভিয়েত সাহিত্যের সবচেয়ে প্রবল শিল্প-ঐতিহ্য হল বিগত শতাব্দীর চিরায়ত সাহিত্যের বাস্তবতা এবং এই শতাব্দীর বিশেষ বাঁকটি (গোর্কীর রচনা)। যে উৎসাহ নিয়ে গোর্কী সোভিয়েত শিল্পের তরুণ প্রতিভাগুলির সমাবেশ ঘটিয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক সৌন্দর্যতত্ত্বের নীতি নির্ধারণ করেছিলেন তা অবিস্মরণীয়। সোভিয়েত লেখকদের মনে আজও তা গাঁথা রয়েছে।

শিল্পকর্মে বাস্তবতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিল্পী দৃষ্টিভঙ্গী-সংক্রান্ত মতবাদ পরিণত

হতে বেশ কয়েক বছর লেগেছে। সোভিয়েতের শিল্প-সংস্কৃতির জগৎ নির্মাণে প্রতিভাবান লেখকদের অবদান ও সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা উপকরণের জোগান দিয়েছে। মার্কসবাদ এবং লেনিনের বিপ্লবী প্রতিভা তাত্ত্বিক ও সমালোচকদের অনুপ্রাণিত করেছে। তাছাড়া প্রত্যাশা জেগেছিল যে তাঁরা সোভিয়েত শিল্পের নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যগুলিকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করবেন এবং স্থির করবেন শিল্পগত ঐতিহ্যের সাথে তাদের কি কি মিল আছে এবং কি কি তাদের যথার্থ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করে তোলে। এভাবে সোভিয়েত সাহিত্যে একটা মতাদর্শগত এবং শিল্পদৃষ্টিভঙ্গীগত ভিত্তি—সামাজিক বাস্তবতার পদ্ধতি নির্ণীত হয়েছিল। শিল্প-সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সৃজনশীল ঐতিহ্যে পরিণত হবার পর এক দশকেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে।

সোভিয়েত শিল্পের বিরোধীদের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে নজরে পড়ে, তা হল, তিনটি শব্দের একটি প্রচলিত কথা 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তব ঐতিহ্য'। এই কথাগুলি আমাদের পশ্চিমী সমালোচকদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে প্ররোচিত করে। কারণ তাঁদের কাছে ব্যাপারটা চিরকালই ক্ষোভের উৎস। তাঁদের রাগের প্রকৃত কারণ অবশ্য 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি। কিন্তু সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলার মানেই হচ্ছে খোলাখুলি একটা মতবাদ প্রকাশ করে ফেলা। একজন শিল্পীকে আক্রমণ করতে হলে 'বাস্তবতা বা ঐতিহ্য' শব্দটির জালে জড়িয়ে ফেলা বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এবং তা কম রাজনীতি-ঘেঁষা বলেও মনে হবে। সেইজন্য সমালোচকেরা এক বাক্যে চীৎকার করে বলেন যে 'বাস্তবতা' সেকেলে হয়ে গেছে, আর কোন 'ঐতিহ্য'কে অনুসরণ করা মানে হল রক্ষণশীল বনে যাওয়া। তাঁরা পশ্চিমী দেশে বাস্তবতাবাদী শিল্পীর ছড়াছড়ি সম্পর্কে উল্লেখ করতে চান না। (সম্ভবতঃ তার কারণ হচ্ছে তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রগতিশীল মানুষ আছেন যাঁদের সমাজতন্ত্রের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি আছে)। এবং তার ফলে যে অসঙ্গতির সৃষ্টি হচ্ছে তাতে তাঁদের আদৌ বিচলিত বলে মনে হচ্ছে না।

যাই হোক, তাঁরা ছন্দ, চরণ ও সাধারণভাবে অনুমোদিত তাল থেকে মুক্ত কাব্যকাঠামোর গুণকীর্তন করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা ভুলে যান অথবা চোখ বুঁজে থাকেন যে এটাও ঐতিহ্যের অন্তর্গত। এভাবেই তাঁরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন। একশো বছর আগে এর ব্যবহার হয়েছে, তার আগে যাবার দরকার নেই। করেছেন ওয়াল্ট হুইটম্যান, তারপর বেলজিয়ামের এমিল ভেরহান এবং

অন্যান্য পশ্চিমী কবিরা এর ব্যবহার করেছেন ; তারপর গত শতাব্দীর শেষের দিকে জার্মান কবি আর্নো হোল্‌জ সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গিমায় ছন্দকে ভিত্তি করে নির্মাণ করেন নতুন গীতিকবিতার কাঠামো। এই ছন্দ ব্যক্তির আত্মগত অনুভবে সহজেই ধরা পড়ে। তৎসত্ত্বেও এইভাবে বাস্তবতার ঐতিহ্য সম্পর্কে পশ্চিমী প্রতিবাদীরা সোভিয়েত সাহিত্যের 'অনগ্রসরমানতা'কে প্রলুব্ধ করতে পারবে বলে আশা রাখেন।

সোভিয়েত সাহিত্যের আদিযুগে সর্বহারা লেখকেরা প্রায়ই মুক্তছন্দে কবিতা লিখতেন, এ বিষয়ে আমাদের তরুণ কবিরা সচেতন আছেন। অন্যান্য আঙ্গিক সহযোগে এই ধরনের কবিতা মায়াকোভস্কিও লিখেছেন। মৌলিক তফাৎটা ছিল এই যে, তিনি যে-সময়ে প্রচণ্ড ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী কবি ছিলেন, তখনও তিনি আত্মকেন্দ্রিকতার বিরোধী ছিলেন। মেগাফোনের মত ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর এবং তা বিপ্লবী জনগণের চঞ্চল ও অবিচল কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে যেত। বিষয়বস্তু এবং সামাজিক অর্থের দিক থেকে তাঁর কবিতায় ছিল নতুনত্ব। সেজন্য মায়াকোভস্কির নব-সৃজনের ফলে প্রকৃত আঙ্গিক তৈরি হয়েছিল এবং তা শুধু প্রয়োগের উপযুক্ত বাহন হয়ে থাকেনি। মায়াকোভস্কি নিজেও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁরা আমাদের এই বলে ভয় দেখাতে চান যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা একটা মাপকাঠি দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিমাপ করতে চায়। এভাবে তাঁরা শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে ছোট করে দেখাতে চান। এখানে আমরা এমন কি খুব ব্যাখ্যায় না গিয়েও লিওনিদ আন্দ্রেয়েভের অবক্ষয়ী রচনাবলী প্রসঙ্গে লিও তলস্তয়ের সুবিখ্যাত মন্তব্যটি স্মরণ না করে পারি না : 'তিনি আমাদের ভয় দেখান, কিন্তু আমরা ভয় পাই না।' আমরা ভয় পাই না, কারণ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শৈল্পিক প্রতিভার এক অনন্ত বৈচিত্র্য। তার একটার সঙ্গে আরেকটার পার্থক্য শুধু জাতীয় বৈশিষ্ট্যেরই নয়। বরং তা রয়েছে প্রতিটি সমদৃষ্টিসম্পন্ন সোভিয়েত জাতির উপকরণের মধ্যে, জগৎ সম্পর্কিত তাঁদের দৃষ্টিকোণ, তাঁদের শৈল্পিক আচরণ এবং তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠার কলাকৌশলের মধ্যে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার একমাত্র মূল স্রোতের মধ্যে আঙ্গিক এবং ঝোঁকের ওপর জোর দেওয়া কখনও বন্ধ হয়নি। এটা শিল্পীদের কায়দাকানুন সংশোধন করার জন্য একনাগাড়ে আবেদন জানানো হচ্ছে। ঠিক একটা উদাহরণের কথা মনে করা যাক। সবচেয়ে যে শক্তিশালী রোমান্টিক ধারাটি আমাদের গদ্যে অবিরাম বয়ে চলেছে সেই প্রথম

অভ্যুদয়ের দিন থেকে। আর, তার পাশাপাশি বইছে সাম্প্রতিক গদ্য-লেখকদের গভীর লিরিকধর্মিতা। এই লেখকেরা অনুভূতির প্রাবল্যের দিক থেকে তাঁদের সাথী-শিল্পী কবিদেরই সমতুল।

আমাদের সাহিত্য যখন সবে পা ফেলতে শুরু করেছিল, তখন গোর্কী বলেছিলেন যে সোভিয়েত দেশে ইতিহাসের ধারায় একক ব্যক্তিত্বের তাৎপর্য ক্রমেই বাড়ছে। সেই বৃদ্ধিটা হচ্ছে বজ্রগতিতে। তার ভাবনাবটা প্রকাশ করতে ঐ কঠিন দিনগুলির প্রকৃত ইতিহাসের ধারা স্থিরীকৃত হয়। সাম্প্রতিক সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে মানবিক কার্যকলাপের প্রতিটি ক্ষেত্রে একক ব্যক্তিত্বের তাৎপর্যের আরও জীবন্ত সাক্ষ্য প্রচণ্ডভাবে দেখা যাচ্ছে। ব্যক্তি তো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, আর সমাজও তো তার শ্রেষ্ঠ মানুষগুলির আদলে তৈরি হয়। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে 'মানুষ' কথাটাই তো সবচেয়ে উচ্চস্থান পেয়ে এসেছে। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত ঠিকানা এবং তার নৈতিক গুণাবলীর শুদ্ধিকরণই সরকার ও সমাজের সমগ্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাটার কাছে সবচেয়ে চিন্তার বিষয়।

পশ্চিমী জগৎটা সম্ভবতঃ কেবলমাত্র কমিউনিজম-বিরোধিতা এবং তার প্রচারকদের নিয়েই গঠিত নয়। মনে রাখতে হবে, যাঁরা শিল্প সংস্কৃতিতে সক্রিয় তাঁরা যে-কোনভাবেই হোক, আধুনিক ঝোঁকগুলিকে সমর্থন জানান। সোভিয়েতের শিল্পী-জীবন সম্পর্কে পশ্চিমী দেশে যেসব সমালোচনামূলক মন্তব্য করা হয় তার অনেকগুলিরই উৎপত্তি এর প্রতি জনগণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ থেকে। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ক্রমেই সংখ্যায় বাড়ছে, ফলে, সমাজতান্ত্রিক ও পশ্চিমী, উভয় দেশেই অনেক বেশি সংখ্যায় মানুষ তাতে অংশ গ্রহণ করেছেন।

সোভিয়েত লেখকেরা এ ধরনের মিলনকে তীব্র করে দেওয়াটা জরুরী কাজ বলে মনে করেন। এক নতুন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এখন পৃথিবীতে সমগ্র মানবজাতিকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বস্তরের জনগণের সাহায্যের প্রশ্ন রয়েছে। এই কাজে তারা প্রয়োজনীয়তার দ্বারা পরিচালিত হয়। সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির সীমান্ত অঞ্চল ছাড়িয়েও এখন :শ্রেণীসমাজের প্রচলন রয়েছে। সুতরাং সম্পূর্ণ বিপরীত শিবিরের শিল্প-সংক্রান্ত বুদ্ধিজীবীদের 'আদর্শগত সংমিশ্রণ' সম্পর্কে কোন কথাই উঠতে পারে না। দিন যতই যেতে থাকে ততই কতকগুলি সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সত্যতা ইতিহাস স্বীকার করে। ফলে অন্যান্যদের

প্রতি তাদের মিথ্যাচরণ আরো বেশি লোকের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। আমরা বলতে পারি না যে বিরোধীদের সঙ্গে আমাদের মতপার্থক্য বন্ধ হোক। আবার অন্যদিকে শিল্পক্ষেত্রে আমাদের আলোচনাও ভেঙে দেওয়া যায় না। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিজেকেই নিজে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে—এ বিষয়ে আমরা স্থির বুঝেছি —আর আবেগবশে কেউ যদি এর সপক্ষে কিছু বলে, তা তো আমরা বন্ধ করে দিতে পারি না। তাহলে একজন প্রকৃত শিল্পীর অস্তিত্বই থাকে না।

আমরা একটা নতুন জগৎ তৈরি করছি। আর সেই জগতের মধ্যে আমরা এক নতুন প্রজন্ম তৈরি করছি। সেই গৌরবময় কর্মকাণ্ডে অবদান রেখে যাওয়াই হল সোভিয়েত শিল্পীদের কর্তব্য।

কবি ও তাঁর কবিতা

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

পাবলো নেরুদা

আমাদের যুগটাই হল যুদ্ধ, বিপ্লব আর সামাজিক অভ্যুত্থানের। এ যুগে আমাদের সামনে সুযোগ রয়েছে কবিতার নিত্যনতুন দিগন্ত আবিষ্কারের। এর আগে তা ছিল কল্পনার বাইরে। সাধারণ মানুষ আজ কবিতার মুখোমুখি। তারা যখন আক্রান্ত হয় কিংবা যখন পাল্টা আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়, নির্জনে কিংবা বিশাল জনসমাবেশে, সর্বত্রই তারা কবিতাকে সামনে পায়।

প্রথমে আমি যখন আমার নিঃসঙ্গতার বইগুলি লিখি তখন আমার মনেও হয়নি যে যত সময় যাবে কবিতা পড়বার জন্য আমার ডাক আসবে মাঠে ময়দানে, কলে কারখানায়, পার্কে, জনসমাবেশে, বক্তৃতামঞ্চে, প্রেক্ষাগৃহে সর্বত্র। চিলির এমন জায়গা নেই যেখানে আমি যাইনি কবিতা পড়তে। আমার কবিতার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছি আমার দেশের মানুষের জন্য।

একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। চিলির সান্টিয়াগো শহরের সবচেয়ে বড় বাজার হল ভেগা সেন্ট্রাল। বাজার শ্রমিকদের আছে শক্তিশালী ইউনিয়ন। ওরা দিনরাত খাটে। মজুরি পায় কম। পায়ে জুতো নেই। খাবার সময় সস্তার কফিখানায়, রেস্তোরাঁয় ভিড় করে। একদিন একজন এল গাড়ি নিয়ে আমাকে নিতে। জানতুম না কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে। পকেটে ছিল আমার একটা নতুন কবিতার বই। স্পেনের যুদ্ধের ওপরে লেখা 'এসনানা এন এল কোরোজান'। যেতে যেতে শুনলুম যে ভেগা বাজারের মাল-বওয়া শ্রমিকদের ইউনিয়ন হলে আমাকে কিছু বলতে হবে। হলে ঢুকে দেখি জন পঞ্চাশেক শ্রমিক বসে আছে, কেউ প্যাকিং বাক্সের ওপর কেউ বা বেঞ্চিতে।

কারো কারো কোমরে জড়ানো রয়েছে চটের থলে—অ্যাপ্রনের মতো। কারো গায়ে তাপ্পি-দেওয়া শার্ট। জুলাই মাসের সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অনেকেরই গায়ে কিছু নেই।

সেই অসাধারণ শ্রোতাদের সামনে বসলুম আমি। ব্যবধান শুধু একটা ছোট টেবিল। ওরা স্থির দৃষ্টিতে, আমার দেশের মানুষের কয়লা কালো চোখ নিয়ে, দেখছিল আমাকে। কী বলব আমি এদের? আমার জীবনের কোন্ জিনিসে ওদের আগ্রহ থাকতে পারে? ভাবলুম কতক্ষণে ছাড়া পাব? তারপর বইটি তুলে নিয়ে বললুম, কিছুদিন আগে গিয়েছিলুম স্পেনে। সেখানে এক নিদারুণ যুদ্ধ হচ্ছে। আপনারা শুনুন সে বিষয়ে আমি কী লিখেছি। বইটি সহজ ছিল না। কিন্তু তাতে ছিল মর্মবেদনার কথা।

ভেবেছিলুম দু-একটা কবিতা পড়ে চলে যাব। কিন্তু তা হল না। একটার পর একটা কবিতা পড়ছি। সেই নিস্তব্ধ হলঘরে আমার কবিতার শব্দোচ্চারণ আমি নিজে অনুভব করতে পারছিলুম। দেখছিলুম সেই চোখগুলো কীভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিল নিবিষ্টতায়। বুঝতে পারলুম, আমার কবিতা তাদের মন স্পর্শ করছে। কবিতার পর কবিতা পড়ে যেতে লাগলুম। কী এক চুম্বক শক্তি যেন আমার কবিতার সঙ্গে সেই বঞ্চিত হৃদয়গুলিকে পরস্পর গেঁথে দিয়েছিল।

এক ঘন্টারও বেশি কবিতা পড়া চলল। চলে আসবার মুখে শ্রোতাদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়াল। ওর কোমরে বাঁধা ছিল চটের খালি বস্তা। বললে, আমাদের সকলের হয়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই পাবলো। আপনাকে আরও জানাতে চাই যে এমনভাবে আমরা আর কখনো অভিভূত হইনি। কথা বলা শেষ করে সে কান্না চাপতে পারল না। আরও অনেকেই আবেগে কাঁদছিল। ভেজা চোখ আর কর্কশ করমর্দনের উষ্ণ স্পর্শ নিয়ে বেরিয়ে এলুম আমি। এই আগুন আর তুষারের পরীক্ষার পরও কি কোনো কবি একই রকম থাকতে পারেন?

কবিতা তার পাঠকের সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছে। পাঠকের কাছে তা পৌঁছতে পারছে না। কবিতাকে যেতে হবে পাঠকের কাছে, ফিরিয়ে আনতে হবে তাকে। অন্ধকারে হেঁটে যেতে হবে তাকে···মানুষের হৃদয়ের মুখোমুখি হতে হবে। তাকাতে হবে নারীর চোখের দিকে। চিনতে হবে পথচলতি সেই অজানা মানুষদের যারা সন্ধ্যালগ্নে কিংবা নক্ষত্রের রুপোলী আগুনভরা রাতে অন্তত একটি কবিতার পংক্তির প্রয়োজন অনুভব করে। এই অপ্রত্যাশিতের

কাছে যাওয়া....দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করার সমান, অনেক কিছু লেখাপড়া ও শেখার সমান। আমাদের নিঃশেষে মিশে যেতে হবে তাদের মধ্যে যারা কিছু জানে না। তাই তারা একদিন রাস্তার ধুলোবালি থেকে, অরণ্যে হাজার বছর ধরে অলক্ষ্যে যে পাতা ঝরছে তার ভিতর থেকে নরম হাতে তুলে নেবে আমাদের তৈরি জিনিস ....তখনই আমরা সত্যিকারের কবি হতে পারব। এভাবেই কবিতা বেঁচে থাকবে।

আমার হাতে যে-উপকরণ আছে তা দিয়েই আমি লিখি, যে উপকরণে আমি নিজে তৈরি...আমার অনুভূতি, অস্তিত্ব, পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী, যুদ্ধবিগ্রহ, বইপড়া, আমি সর্বভুক। আমি গোটা পৃথিবী গ্রাস করতে চাই। আমি শুষে নিতে চাই গোটা সমুদ্র।

যে কবি বাস্তববাদী নয় সে মৃত। কিন্তু যে কবি শুধুই বাস্তববাদী সেও মৃত। যে কবি যুক্তিহীন বেখাপ্পা তাঁর কবিতা শুধু তিনিই এবং তাঁর প্রিয়জনই বুঝবেন। যে কবির কবিতা কেবলই যুক্তিসর্বস্ব তা একজন নীরস পাঠকও বুঝবেন, সেটাও তার পক্ষে মর্মান্তিক। কবিতার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। ঈশ্বর কিংবা শয়তান কেউই কবিতার মালমশলা ঠিক করে দেয়নি। কিন্তু এই দুই মহাশয় ব্যক্তি কবিতার জগতে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন সমানে। এই লড়াইয়ে প্রথম জন জেতেন তো পরে জেতেন দ্বিতীয় জন। কিন্তু কবিতার কোনো হার নেই।

কবির কাজকর্মকে আজকাল নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে অনেকটা। এত নতুন নতুন কবি গজাচ্ছে যে শিগগিরই আমরা সবাই কবির মতো দেখতে হব এবং পাঠকদের কোনো পাত্তা থাকবে না। তখন পাঠকের খোঁজে যেতে হবে আমাদের —উটের পিঠে চড়ে মরুভূমি অভিযানে অথবা মহাকাশযানে চড়ে অন্তরীক্ষ পরিক্রমায়।

কবিতা মানুষের হৃদয়ের গভীরের কথা। এ থেকেই তৈরি হয়েছে উপাসনা সঙ্গীত, ধর্মের উপাদান। প্রকৃতির মুখোমুখি হয়েছিল একদিন কবি এবং আদিযুগে সে নিজেকে বলত পুরোহিত মন্ত্রদাতা—তার জীবিকাকে রক্ষা করার জন্য। একইভাবে আধুনিককালেও কবিতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কবি রাস্তার জনসাধারণের সম্মান অভিবাদন গ্রহণ করেন। আজকের যুগের সামাজিক কবি এখনও আদিযুগের পুরোহিত সম্প্রদায়েরই সদস্য। প্রাচীন কালে তার সন্ধি ছিল অন্ধকারের সঙ্গে, আজ তাকে আলোকের ব্যাখ্যাতা হতেই হবে।

আমি মৌলিকতায় বিশ্বাসী নই। এটা এযুগের একটা অন্ধবিশ্বাস যা দ্রুত বিলুপ্তির পথে। আমি বিশ্বাস করি ব্যক্তিত্বে। যে-কোনো ভাষার মাধ্যমে, যে-কোনো সৃজনপ্রক্রিয়ার সহায়তায় তাতে পৌঁছুনো। নিখাদ মৌলিকতা একটা আধুনিক আবিষ্ক্রিয়া এবং নির্বাচনী ভাঁওতামাত্র। কেউ কেউ আছেন যাঁরা নিজের দেশে নিজের ভাষায় এবং সর্বত্র বিশ্বকবির সম্মান চান। তাই তাঁরা নির্বাচকদের খোঁজেন। যারা সেই সম্মানের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হবে তাদের দিকে ছুঁড়ে দেন অসম্মানের বাণ। কবিতা পরিণত হয় তামাসায়।

আমি আমার নিজের সুর বজায় রেখেছি। যতদিন গেছে নিজের স্বভাবেই তা শক্তি সঞ্চয় করেছে, যেমন করে সব প্রাণী। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আমার প্রথম দিককার কবিতার প্রধান অবলম্বন হল হৃদয়াবেগ। এমন কবি কে আছেন যিনি তাঁর হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দেন না। কিন্তু বছর চল্লিশ লেখালেখির পর আমি বিশ্বাস করি যে কবি তাঁর কবিতায় আবেগকে সংহত করে রাখতে পারেন। আমি নিয়ন্ত্রিত স্বতঃস্ফূর্তায় বিশ্বাসী। সেজন্যেই কবিকে সব সময়েই কিছুটা সঞ্চয় রাখতে হয় তাঁর পকেটে—জরুরী প্রয়োজনের জন্য। তাঁর সেই সঞ্চয়ে থাকবে প্রতিষ্ঠিত কাব্যকলা, শব্দনির্বাচন, ধ্বনি, চিত্রকল্প সব কিছুই যা মৌমাছির মতো গুঞ্জরণ করবে তাঁর মনে। যেগুলো খুব দ্রুত তুলে এনে কবির সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে পুরতে হবে।

আমি এ বিষয়ে কিছুটা অলস। কিন্তু আমার এ উপদেশ হয়তো কাজে লাগবে। মায়াকোভস্কির একটা ছোট নোটবই ছিল। সব সময়েই তিনি তা কাজে লাগাতেন। অনুভূতিও সঞ্চয় করে রাখতে হয়। কীভাবে? এ বিষয়ে সচেতন হয়ে যখন তা মনে উদয় হয়। তারপর কাগজে কলমে লেখবার সময় সেই বোধ স্পষ্টতরভাবে আমাদের কাছে আসে আসল অনুভূতির চেয়েও প্রখরভাবে।

আমার অধিকাংশ কবিতায় আমি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি যে একজন কবি যে-কোনো বিষয়ে লিখতে পারেন, গোটা সমাজের পক্ষে প্রয়োজন এমন বিষয়ে। প্রাচীনযুগে প্রায় সমস্ত কাব্যই ফরমাসে লেখা। জর্জিকস্ রচিত হয়েছিল রোমানদের চাষাবাদের গুণগান করার জন্য। একজন কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য লিখতে পারেন। শ্রমিক ইউনিয়নের জন্যও লিখতে পারেন। দক্ষ শ্রমিক বা কোনো বিশেষজ্ঞ সবার জন্যই। শুধু এর জন্য কবির স্বাধীনতা বিপন্ন হয়নি। অলৌকিক প্রেরণা বা ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত গালগল্প মাত্র।

তীব্র সৃজনশীলতার মুহূর্তে কোনো রচনা অংশতঃ অপরের হতে পারে, অধ্যয়ন বা বাইরের কোনো চাপের ফলে।

জনতার কাছ থেকে আমি অনেক শিখেছি। মানুষের ভিড়ের সামনে আমি কবির সহজাত সংকোচ নিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু একবার আমি ওদের মধ্যে গিয়ে পড়লে আমি যেন সম্পূর্ণ বদলে যাই। আমি অপরিহার্য সংখ্যাগরিষ্ঠদেরই অংশ। মানবতারূপ বিশাল মহীরুহের আমি একটি পাতা। আমাদের কালে একজন কবির দায় থাকবে নির্জনতা এবং জনতা উভয়ের প্রতি। নির্জন মুহূর্তে আমার দেশ চিলির সমুদ্রসৈকতে তরঙ্গের খেলা আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। তটের পাহাড় শ্রেণীর সঙ্গে সমুদ্রতরঙ্গের সংগ্রামে বিমোহিত হয়েছি আমি। আমাকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে বিশাল সমুদ্রজীবন, যাযাবর পাখিদের ঝাঁক আর ফেনিল সমুদ্রতরঙ্গের সৌন্দর্য।

কিন্তু আমি মানবজীবনের বিশাল তরঙ্গউৎক্ষেপ থেকে আরও বেশি শিখেছি। আমি শিখেছি সেই সব সহস্র চোখের কোমল দৃষ্টি থেকে যারা আমাকে একসঙ্গে লক্ষ্য করেছে। এই অনুভূতি হয়তো সব কবির নাও হতে পারে, কিন্তু যাঁর এই উপলব্ধি হয়েছে তিনি হৃদয়ে তা ধরে রাখবেন এবং তাঁর কবিতায় তা প্রতিফলিত হবে।

বহু মানুষের জন্য আশার প্রতীক হওয়া, যদি তা এক মুহূর্তের জন্যও হয়, তা হবে একজন কবির পক্ষে অবিস্মরণীয় এবং গভীর মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা।

সাহিত্য ও বাস্তব

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

হাওয়ার্ড ফাস্ট

লেনিনের মতে, শ্রেণী বলতে বোঝায় বিভিন্ন সুবৃহৎ জনগোষ্ঠী যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধাধরা উপাদান সম্পর্কের দ্বারা পরস্পর থেকে আলাদা। এরা পরস্পর থেকে আলাদা শ্রমের সামাজিক সংগঠনে ভূমিকার ক্ষেত্রে। ফলতঃ সামাজিক সম্পদের অংশ অর্জনের বিভিন্ন মাত্রা এবং উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক উৎপাদনের ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তাদের অবস্থান নির্বিশেষেও তারা পরস্পর থেকে পৃথক। সমাজ অর্থনীতির নির্দিষ্ট কাঠামোয় শ্রেণী বলতে বোঝায় এমন আলাদা আলাদা গোষ্ঠী যারা তাদের অবস্থানগত সুবিধার সুবাদে একে অপরের ওপর ভোগদখল চালাতে পারে।

মার্কসবাদী মাত্রেই বিশ্বাস করেন যে, ইতিহাসের আরম্ভ বা সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই ইতিহাস অর্থে বোঝায় শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। তাঁরা আরো বিশ্বাস করেন, এই শ্রেণীসংগ্রাম বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত এবং খুব সহজেই এই সংগ্রামকে তিনটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে; যেমন—(১) দাস যুগ, (২) সামন্ত যুগ এবং (৩) ধনবাদী যুগ। এই স্তরগুলির প্রত্যেকটিতেই উৎপাদন পদ্ধতির প্রকারভেদে শ্রেণীগুলির আন্তর্সম্পর্ক নির্ধারিত হত। মার্কসবাদীরা স্থিরভাবে আরো বিশ্বাস করে, ধনতন্ত্র একদিন সমাজতন্ত্রের কাছে পরাভূত হবে, এই সমাজতন্ত্রের উচ্চতর পর্যায় হল সাম্যবাদ, শ্রমিকশ্রেণীই চূড়ান্তভাবে শ্রেণীশোষণের অবসান ঘটাতে পারে এবং শ্রমিকশ্রেণীই হ'ল একমাত্র শ্রেণী যে নিজেকে মুক্ত করে চিরকালের মত শ্রেণীশোষণের অগণিত বিভীষিকা থেকে মানব-জাতিকে মুক্ত করতে পারে। মার্কসবাদীদের নিশ্চিত বিশ্বাস, এই

চূড়ান্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এবং যাকে এঙ্গেলস বলেছেন 'মানুষের শোষণের আদিম ইতিহাস ধ্বংস করতে নেতৃত্ব হাতে তুলে নেবে কম্যুনিষ্ট পার্টি, যে পার্টি হল পৃথিবীর প্রতিটি দেশের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি'।'

যদি লিখিত ইতিহাস বলতে শ্রেণী-ইতিহাস বোঝায় তাহলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীন সাহিত্য বাদ দিলে সাহিত্য হবে শ্রেণী সাহিত্য। যদি কোন দেশের নিয়ন্ত্রক প্রত্যয়গুলো শাসকশ্রেণীর প্রত্যয় হয়, তাহ'লে সেই দেশের সাহিত্য অধিকাংশক্ষেত্রে সেই সব প্রত্যয়ের বাহক হয়ে ওঠে। একথা বলার অর্থ এই নয় যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন প্রতিবাদী সাহিত্য হতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থায় সুবিপুল ব্যঙ্গাত্মক এবং প্রত্যক্ষ প্রতিবাদী সাহিত্যের বিকাশ ঘটে থাকে। কিন্তু, ধনতন্ত্রে কখনই এই প্রতিবাদী ধারা নিয়ন্ত্রকধারা হয়ে উঠতে পারে না। 'লেখক হলেন সাধারণ মানুষের বিবেক' এই শিরোনামায় এক সুলিখিত প্রবন্ধে অ্যালবার্ট মালৎস্ বলেন :

'সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাধান্য অর্জন করেছেন মুখ্যত সেই সব লেখক যাঁরা তাঁদের জীবনে ও কর্মে সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং ভালোবাসায় অন্যদের থেকে আলাদা। এঁরা কখনই বিশ্বনিন্দুক মানসিকতা দ্বারা আক্রান্ত নন। এঁরা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র, কেননা এঁরা সমসময়ের সুদূরপ্রসারী এবং প্রায়শঃই প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের প্রতি বিশেষভাবে দায়বদ্ধ থাকেন। যদিও সমস্ত সাহিত্যের এটাই সামগ্রিক ইতিহাস নয়, কিন্তু এটাই এর মুখ্য ধারার ইতিবৃত্ত। এর অন্যথা হবে কি করে? লেখক যেহেতু মানবিক মানুষ অন্যের দুঃখে তিনি আপ্লুত হবেন। লেখক তাঁর উপকরণ হিসেবে তাঁর চারপাশের আর সব মানুষ ছাড়া আর কোন্ উপকরণই বা ব্যবহার করবেন? যদি তাঁর হৃদয়ে থাকে মমতা, মন হয় অনুসন্ধিৎসু এবং দৃষ্টি হয় সংবেদনশীল, কি করে তিনি এই অসম্পূর্ণ জগতের ছবি, অথবা তাঁর হৃদয়ের সুন্দরতর জগতের বাসনা প্রতিফলিত না করে স্থির থাকবেন?'

এই মন্তব্য অবশ্যই বেশ সহৃদয় এবং উদার, তথাপি তা সত্যের ভগ্নাংশ মাত্র। আমেরিকায় এবং অন্যত্র বহু লেখক আছেন যাঁরা সাধারণ মানুষের প্রতি সমবেদনা এবং ভালোবাসার ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে পৃথক। কিন্তু তাঁরা পরিণত ধনতন্ত্রে প্রধান ধারা হয়ে উঠতে পারেননি এবং আজ মুর্গীর দাঁতের মতই তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। আরো সঠিকভাবে বললে বলতে হয়, আজ আমেরিকার সাহিত্য দখল করে রেখেছেন সেই সব লেখক যাঁরা সর্বশক্তিমান ডলারের প্রতি ভালোবাসায়, অনন্ত

এবং নিজেদের চামড়ার প্রতি গভীর সমবেদনা-পরায়ণ। আমি জানি না, তাঁরা কতখানি সহকর্মী এবং সংবেদনশীল। কিন্তু এটা আমি জানি যে তাঁরা যে দ্রব্য উৎপাদন করেন, তা' উপন্যাস কি রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র বা বেতার যাই হোক না কেন, দু'একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া, তাঁরা যে জগতে বাস করেন তার সঙ্গে তাঁদের বিষয়গত সত্যের আসলে কোনই সম্পর্ক নেই; যেমন নেই জাগতিক প্রবাহে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর বাস্তব প্রতিফলন।

ধনতন্ত্রের ঐতিহাসিক অতীতে আজকের তুলনায় অনেক বেশি লেখক বাস্তব সত্যকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সর্বদাই সংখ্যায় অল্প, সর্বদাই বিদ্রোহী বলে চিহ্নিত, সর্বদাই নিন্দিত, সর্বদাই কোন-না-কোন ভাবে নিগৃহীত। অ্যালবার্ট মালৎস্, আরো নির্ভুল হতেন যদি তিনি বলতেন, সেই সব লেখা আবর্জনাতুল্য সব রচনাকে পরবর্তীকালে অনেক পেছনে ফেলে যায়; যে জন্যই 'আয়রণ হীল' এখনো পুনর্মুদ্রিত এবং পঠিত হয়, আর 'ইন্ হিজ স্টেপস্' লাখ খানেক কপি প্রকাশকালে বিক্রী হলেও, এখন তা প্রায় মৃত এবং বিস্মৃতির অতলে।

'এর ব্যতিক্রমই বা হত কি করে?' —মালৎস্ প্রশ্ন তুলেছেন। লেখকরা যেহেতু মানবিক, অন্য মানুষের দুঃখ কষ্টে তাঁরা আপ্লুত হন। লেখক তাঁর লেখায় কোন্ উপকরণ ব্যবহার করবেন, যদি তিনি চারপাশের মানুষের জীবনের দিকে না তাকান?

দুঃখের বিষয়, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। বিষয়টি এত সরলও নয়। যদি তাই হ'ত তা হলে আজ সাহিত্য যে বদ্ধজলাশয়ে পরিণত হয়েছে, এমনটি হ'ত না। এটা কেবল মাত্র আপন চৌহদ্দির মানুষের জীবনকে সাহিত্যগত উপকরণ হিসাবে ব্যবহারের সমস্যা নয়, বাস্তবতার নিরিখে উল্লিখিত মানুষের জীবনকে দেখাই অধিকতর জটিল সমস্যা। বেতারে, চলচ্চিত্রে এবং উপন্যাসে উপলব্ধি বলে যা চালানো হয় প্রকৃত শিল্প এবং স্পর্শকাতর হ য ব র ল এর মধ্যে সেটাই আসল ফারাক।

এর অর্থ এই নয় যে আজকের বাস্তবতা অতীতের বাস্তবতা থেকে ও বোঝার দিক থেকে অনেক বেশি কঠিন। সহজ কথা হল, আজকের বাস্তবতা ভিন্ন রকম। শ্রেণীসমাজের ঐতিহাসিক শেষ যুগে আমরা বাস করছি। কোন নব্য শোষক-শ্রেণী ক্ষয়িষ্ণু, অসার জীর্ণ শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে না। কোন প্রগতিশীল ধনতন্ত্র সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত করার জন্য বসে নেই। সামনে কেবল একমাত্র ভবিষ্যৎ যখন শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে, জনগণের সহশক্তি হয়ে

চিরকালের জন্য শ্রেণীসমাজের অবসান ঘটাবে। আর এই ভবিষ্যৎ কেবল দশ বা পঞ্চাশ বছরের পরবর্তী কালের শূন্যগর্ভ ভবিষ্যত নয়, এই ভবিষ্যত ইতিমধ্যেই বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত।

এই প্রসঙ্গে সাহিত্যে বাস্তবতার প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার ; ধনতান্ত্রিক বাস্তবতা বলতে কি বোঝায় তার কিছুটা উপলব্ধির চেষ্টা করাটাও আবশ্যক।

সাহিত্য-সমালোচকরা অন্যান্য সমালোচকদের মতই এক ধরনের প্রক্রিয়ায় বিশেষ অনুরক্ত। এটাকে একটি সুন্দর ভিক্টোরীয় নীতিবাক্যের সাহায্যে এভাবে বর্ণনা করা যায় : সবকিছুর জন্য জায়গা এবং জায়গামত সবকিছু। তাঁরা পছন্দ করেন নাম, পদবী, শ্রেণী, গোষ্ঠী এবং উপগোষ্ঠী। তাঁরা একটির নামকরণ করেন অস্তিবাদী, কোনটির বা প্রকৃতিবাদী। একটি মানবতাবাদী হ'লে অন্যটি হবে অধিবাস্তববাদী ইত্যাদি ইত্যাদি ; এই বাছাবাছি এমন যে বিরক্ত ধরে যাবে। এই ধরনের তথাকথিত 'জটিল' এবং 'গভীর' চিন্তা প্রকৃতপক্ষে যে-কোন ধরনের নিরপেক্ষ এবং যুক্তিবাদী ভূমিকার দায়িত্ব থেকে কর্দমাক্ত এক চম্পটপ্রদানের অছিলা খোঁজা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ, জড়ভরত-মার্কা বাগাড়ম্বর ও দুর্বোধ্য বাক্যব্যয় যা বাস্তবতার বদলে যাদু এবং মায়ার মত চেপে বসেছে। ভি. জে. জেরোম তাঁর 'কালচার ইন্ আ চেন্‌জিং ওয়র্লড' বা 'পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সংস্কৃতি' গ্রন্থে এই ধরনের হাততালি কুড়োনোর প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেছেন :

ধনিকশ্রেণী সাংস্কৃতিক শক্তিগুলিকে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের বিচার না করে তাদের কাজে লাগাতে চায়। জনসাধারণের কাছ থেকে সংস্কৃতির সঙ্গে সমাজের প্রকৃত সম্পর্ক গোপন রাখতে বিশেষ অভিলাষী শাসকশ্রেণী দার্শনিক বিভ্রান্তির শব্দের বেড়াজালে এদের প্রতারণাকে যুক্তিসিদ্ধ বলে প্রমাণ করতে চায়। বিশেষ করে সাহিত্য এবং শিল্পে যেখানে আঙ্গিকের বিষয়টি বেশ ব্যাপকভাবে উপস্থিত, ধনতান্ত্রিক দার্শনিক ধারণাগুলো সেখানে অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক সুকৌশলে অনুপ্রবেশ করে ; এমনভাবে যে চট করে ধরা যায় না। অন্য কথায়, বিশুদ্ধ সাহিত্যিক পরিভাষায় বলা যায়, যে সব লেখক ঘটমান বাস্তবকে ধরতে অক্ষম, অনিচ্ছুক, অথবা ভয় পান, তারাই তাদের সাহিত্যের দৃষ্টিকেন্দ্র নিয়ে যান এ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে এবং পরিণত হয় ইলিয়া এরেনবুর্গ যাকে বলেছেন 'স্বপ্নের কারখানা'-য়। কেবল আজ বলেই নয়, কোনদিনই শিল্প কেবলমাত্র স্বপ্নের উপাদানে তৈরি হয়নি। পৃথিবীর যাবতীয় মহান, সবল এবং স্থায়ী শিল্পকর্মে

সর্বদাই বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে। আর তাকে জারিত এবং পরিশোধিত করে লেখকের প্রতিভা। প্রকৃত সত্য অর্থে, শিল্প হ'ল মানবজাতি এবং সত্যের মধ্যে সেতুবন্ধন।

বাস্তবতাবাদ ব্যাতিরেকে অন্য কোন প্রক্রিয়ায় শিল্প সৃষ্টি সম্ভবপর নয়।

কিন্তু বাস্তবতার প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক্ উপলব্ধি থাকা এক কথা, আর মেকী ও নগণ্য 'বাস্তবতার' নামে রুচিহীন যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শিল্প থেকে প্রাণ ও মর্মবস্তু নিংড়ে বার করে দেওয়া হ'ল অন্যকথা। বাস্তবতা কখনই প্রতিভাহীনতার জবাবদিহি করতে পারে না। বাস্তবতা কখনই লেখকশ্রেণীর অক্ষমতার ক্ষমা হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে না। বাস্তবতার মানে এই নয় যে একটা ছুঁচো নোংরা কাদার মধ্য দিয়ে দৌড়োবে। অথবা সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার রূপ, রঙ, বিচিত্র সৌন্দর্য এবং অতুল বৈভবের পরিবর্ত হিসেবে জড, চিন্তাহীন রাজনৈতিক হাততালি কুড়োনো খোঁয়ারী কখনই বাস্তবতার অপর নাম নয়। বাস্তবতার অর্থ 'বামপন্থী' কারাগারে শিল্পকে হাত-পা বাঁধা শেকলে আটকানো নয়; রুচির বদলে সংস্কার, কবিতার বদলে পদ্য, সৃজনশীলতার পূর্ণ পক্ষবিস্তারের বদলে ছককাটা বা অন্তর্দৃষ্টির বদলে বিয়োগ—বাস্তবতা বলতে কখনই তা বোঝায় না। বাস্তবতা প্রেম, সহৃদয়তা ও সংবেদনশীলতার শত্রু নয়। বরঞ্চ বলা যায় বাস্তবতা এই সব বৃত্তির প্রিয়সখা।

সাহিত্যে বাস্তবতা এই জীবনধর্মেরই প্রতিফলন। এ যেন নক্ষত্রলোকের সিঁড়ি এবং শিল্পলোকের এমন সরণী যা মানুষ জানত না এবং কখনো স্বপ্নও ছাখে নি। কতখানি অদূরদর্শী হলে লেখকরা বিশ্বাস করতে পারেন যে, মানবজাতি এমন সব অভাবিত চোখ ধাঁধানো সৌধ নির্মাণ করবে যা কেউ কোনদিন ভাবেনি, অথচ তার অন্তরের ঐশ্বর্য ও পার্থিব সৃষ্টির সমতালে আকাশে পাখা মেলবে এমন সাহিত্য সৃষ্টি করবে না!

তাহলে বাস্তবতর প্রক্রিয়া বলতে কি বুঝব? আমি আগেই বলেছি—লেখকরা নির্বাচন করেন। এই নির্বাচন জীবনের বিশাল ক্যানভাস থেকে। এর ফলশ্রুতি হল কাগজে শব্দের আবির্ভাব ও বিশেষ অবস্থান। আর এই হ'ল সাহিত্যে যাকে বলা হয় সৃজনপ্রবাহ। লেখক এবার নির্বাচন প্রবাহে যুক্ত করেন আঙ্গিকের আভাস, রুচি, পছন্দ এবং ছন্দ। এরই সঙ্গে সংযুক্ত হয় তাঁর বিশ্বদৃষ্টি। বাস্তবতার যে বিশেষ অংশ তাঁর উপজীব্য, তার উপাদানগুলোর উপর আলোকসম্পাত করতে ঐ বিশ্বদৃষ্টি তাঁকে সাহায্য করে।

কোন লেখক প্রকৃতির নকল করেন না; কোন লেখকই পারেননি। যদি কোন লেখক ভাবেন যে তিনি কোন একজন মানুষের জীবনের একটি দিনের পুরো অনুলিপি করবেন, বা সেদিন তার জীবনে যা ঘটল, যা কিছু তার চেতনায় ঢুকে পড়ল বা ছায়া বিস্তার করল, যা কিছু সে দেখল, অনুভব করল, স্বাদ পেল, জানল, বলল, অতীতের যা কিছুর সে স্মৃতিচারণ করল তার পুনরাবৃত্তি করবেন —যদি কোন লেখক এরকম কাণ্ড করবেন ভাবেন, তাহলে তাঁর কয়েকশ পৃষ্ঠা লেখা হয়ে যাবে, কিন্তু তিনি দাঁড়ি টানতে পারবেন না। তিনি যদি কষ্টেসৃষ্টে শেষও করেন, তবুও তা কেবল অর্থহীন আনুপূর্বিক হ য ব র ল হবে, তাকে কোন শিল্পসৃষ্টি বলা যাবে না।

আমি আগেও বলেছি, শিল্প হল এক সংশ্লেষ; শিল্পী কখনই যন্ত্র নন এবং তা' হতেও পারে না কখনো, তার উৎপাদন হল সৃজনশীল, তিনি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা; জীবনের নানা উপাদান নিয়ে তিনি শিল্পকর্ম রচনা করেন। যদি তাঁর শিল্পকর্ম কেবল নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তিনি কি সৃষ্টি করলেন তাতে আমাদের খুব একটা কিছু যায় আসে না। যে লেখক ধরা যাক শুধু নিজের জন্যই লেখেন তাঁর ক্ষেত্রে প্রধান মুশকিল হল, তাঁর সৃষ্ট উৎপাদনকে কোন নির্দিষ্ট মানে বিচার করা যাবে না, কেননা তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে তিনি নিজেই নিজের উপর একটি মান চাপিয়ে দিয়েছেন—আর তাঁর রূপসৃষ্টি যেহেতু তাঁর নিজের জন্যই, তিনি সেটা অন্যান্য লেখকদের মান থেকে আগেই আলাদা করে রেখেছেন।

কিন্তু কোন শিল্পকর্মই কখনো আত্মমুখীন হতে পারে না। সামগ্রিক অর্থে শিল্পরূপে অস্তিত্বশীল থাকার জন্যই শিল্পকর্মকে লেখকের ও পাঠকদের মধ্যে ভাবসঞ্চরণের সেতু হতেই হবে...।

বাস্তববাদ কেবলমাত্র আঙ্গিকের ব্যাপার, বিষয় বস্তুর নয়, এই ধারণা বাস্তবাদের গুরুগম্ভীর অপব্যাখ্যাগুলোর অন্যতম। এই ধরনের আঙ্গিকসর্বস্বতার প্রলক্ষণই বাস্তববাদের প্রশ্নে নানা সংশয় সৃষ্টি করছে। আর এই বিভ্রান্তি থেকেই বাস্তববাদের গোটা ধারণাটাই কলুষিত হয়েছে। মোদ্দা কথা হ'ল, কোন শিল্পকর্ম যদি ভাসাভাসাভাবে বাস্তবসূচী হয়, কখনই তার অর্থ এই নয় যে বাস্তবের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে। বাস্তববাদের মান নির্ণীত হয় বিষয়গত সত্যের পরিস্ফুতির মধ্য দিয়ে। সেটা সাধারণ ক্ষেত্রে হতে পারে বিশেষ ক্ষেত্রেও হতে পারে। কিন্তু সেটা কখনই লেখকের বিশেষ শৈলী ও আঙ্গিকের ওপর নির্ভরশীল নয়। চকচকে ওপরের পালিশে অনেক সময় ভোক্তা নিজেই

প্রতিরিত হতে পারে। শিল্পের ক্ষেত্রে সেই পালিশ সহযোগী তো নয়ই, বরং ক্ষতিকারক।

বাস্তবতার প্রকৃতি উপলব্ধির বাহন হিসাবে ধ্বনিতাত্ত্বিক সংগ্রহণও যথার্থ নয়।

বাস্তবাদের কঠিন বৈশিষ্ট্যের একটি হল শৈলী এবং ভাববস্তুর সমন্বয়। এটা বুঝতে পারা সহজ নয়। এখানেই বিপদ বর্তমান। কেননা এটা কখনই সরল সত্য নয় যে বিষয়বস্তু আপন থেকেই লিখনশৈলী এবং আঙ্গিক হাতে ধরিয়ে দেবে। আরউইন শ' ভাষাশৈলীর একজন বিশেষ দক্ষ প্রতিভা, কিন্তু এই যান্ত্রিক দক্ষতা কখনই শিল্প নয়, আর এই দক্ষতায় ভালো লেখাও হয় না। যাই হোক, এটাও সত্য যে প্রয়োজনীয় ভাষার জ্ঞান ও দক্ষতা ছাড়া ভালো লেখা তৈরি হয় না। আবার এটাও ঠিক যে সেই দক্ষতার বিভিন্ন স্তরও আছে, উপলব্ধিরও নানা স্তর আছে। এই দুটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরের সমন্বয় যিনি ঘটান তাকেই প্রতিভা বলে মান্যতা দান করা যায়।

মার্কসবাদীরা কখনই আঙ্গিককে অস্বীকার করেন না। যদি করেন তো তাদের সেই কারণেই শিল্পকেও অস্বীকার করতে হয়। আমরা আসলে যা প্রত্যাখ্যান করি তা হল বিষয়বস্তুহীন আঙ্গিক। আঙ্গিকের আদর্শীকরণ, অজ্ঞ এবং হীনমন্যের মত আঙ্গিকের পূজা করা এবং একধরনের দৈবী আঙ্গিকতাবাদ সৃষ্টিকে আমরা স্পষ্ট এবং দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করি। আমাদের বক্তব্য হল, বিষয়বস্তু থেকে বিযুক্ত আঙ্গিকের কোন মূল্য নেই। এই আঙ্গিক হল মানুষের গায়ের চামড়ার মত। কিন্তু ভেতরের সব বাদ দিয়ে তো কেবল চামড়া নিয়ে বাঁচা এমন কি নিশ্বাস ফেলাও সম্ভব নয়।

ধনবাদী সাহিত্যে, কিন্তু, বরাবরই এই আঙ্গিকের একক অস্তিত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এই সাহিত্যে প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই আঙ্গিককে বিষয়বস্তু থেকে বিযুক্ত করাই যেন প্রধান লক্ষ্য। সেটা যদি না হত তাহলে বিগত দুই শতাব্দীতে মাঝে মাঝেই ধনবাদী সাহিত্যে প্রবল পশ্চাদগামিতা দেখা দিত না; সচেতন লেখকেরা স্থিতাবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে সেই পশ্চাদ-গামিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, এবং তাঁদের আমলের নতুন বাস্তবের মোকাবিলা করেছেন। ধনবাদী শিল্প ও সাহিত্যে 'আকাদেমী' বলতে যে প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য ও ধারণা তার থেকেই বোঝা যায়, শাসকশ্রেণীর প্রসাদপুষ্ট ও প্ররোচিত আঙ্গিকসর্বস্বতার প্রতি ঝোঁক কত বেশি। আর বহু 'আকাদমী' বিরোধী আন্দোলন যে নতুন ধরনের আঙ্গিকসর্বস্বতায় নিঃশেষ হয়ে গেছে তাতে

পূর্বোক্ত সত্য অস্বীকৃত হয় না। আজকের বাস্তববাদীধারার জন্ম হয়েছে এই বিশের দশকে এবং মূলতঃ এই আঙ্গিকসর্বস্বতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসাবে। আজ যদি দেখা যায় যে এই ধারাও আঙ্গিকসর্বস্বতায় ভুগছে, তাহলে বুঝতে হবে প্রতিক্রিয়াশীলদের চাপ কত প্রবল। যাই হোক, একথা বোধহয় কেউ-ই আর অস্বীকার করবেন না যে গত দশ বছরে ইংরাজী ও আমেরিকান সাহিত্যে অবক্ষয়ের যে লক্ষণগুলো প্রকট হয়েছে, এর আগে তেমনটি দেখা যায় নি।....

বাস্তববাদ এবং ভাসা ভাসা বাস্তব পদ্ধতির মধ্যে একটি মৌলিক ফারাক হ'ল প্রথমটি সংগ্রামজাত এবং অন্যটি সেই সংগ্রাম থেকে পশ্চাদপসরণ। এমনকি খুব সুসময়েও সত্য পাকা ফলের মত ঝুলে থাকে না যে, যে কেউ কামড় লাগাবে। সত্যের জন্য সর্বদাই সংগ্রাম করতে হয় এবং এই সংগ্রাম করে যেতেই হবে, যে সমাজে তার অস্তিত্ব তার বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন। সে ক্ষেত্রে কেবল সংগ্রাম কৌশলের রূপান্তর ঘটে মাত্র। আজ একজন লেখককে আক্ষরিক অর্থে সংগ্রামে নামতেই হবে, কেননা যে ধনতান্ত্রিক বাস্তবতা এই সেদিনও বজায় ছিল আজ তা ক্রমে ক্রমে আরো সীমিত হয়ে পড়েছে। এক নতুন সাহিত্যশক্তি আজ সারা বিশ্বে মুক্তপক্ষ—তা'হল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। আর এটা এখনই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এর ফলশ্রুতি হবে এক নতুন সাহিত্য, নতুন এক বিশ্বদৃষ্টি থেকে এর উদ্ভব, নতুন মানদণ্ডে এর বিচার।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এখন কেবল সূচনার পর্যায়ে, এবং অন্য সবকিছুর মত, এখন উদ্গমের পথে। নতুন চারার কেবল অঙ্কুরোদ্গম দৃশ্যমান। তবুও এই নিরীক্ষণ সার্থক, কেননা এর বীজেই নিহিত আগামী দিনের মহীরুহ।*

*হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর 'লিটারেচার অ্যাণ্ড রিয়্যালিটি' পুস্তকের অষ্টম, নবম ও দশম অধ্যায়ের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ।— স.

লেখক পরিচিতি

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮—১৯৩৬)

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নিঝনি-নভোগরদের এক মজুর আলেক্সি পেশকভ ম্যাক্সিম গোর্কি ছদ্মনামে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি রুশ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্যের আঙ্গিনায় পৌঁছয়। এমন শ্রমসাধ্য, কষ্টকর ও বিচিত্র জীবন পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যিক যাপন করেননি। পৃথিবী ও জীবনের পাঠশালায় তাঁর সমস্ত শিক্ষা। লেনিনের নেতৃত্বে কাজানে ছাত্র বিদ্রোহ দেখা দিলে, কাজানে তাঁর সহকর্মী শ্রমিকরা ছাত্র দমনে জারের সাহায্যে এগিয়ে যায়। মনঃকষ্টে গোর্কি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনক্রমে প্রাণ রক্ষা পায়। পরবর্তী জীবনে গোর্কি যখন রাশিয়ার বিপ্লবী ও কমিউনিষ্টদের সংস্পর্শে আসেন, লেনিন ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রথম সার্থক প্রয়োগ ঘটে তাঁরই রচনায়। তাঁর সাহিত্যেই সর্বহারা শ্রেণীর নিজস্ব সংস্কৃতির রূপরেখা প্রথম চিত্রিত হয়। ১৯০৬ এ লেখা 'মাদার' উপন্যাসের মত জনপ্রিয় এবং সমাজ পরিবর্তনের অমোঘ সাহিত্যের নজির আর নেই। গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক—সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তিনি পৃথিবীতে নতুন সংস্কৃতির সূচনা করে গেছেন। ক্লিম সামঘিন, আর্টামানব, দি থ্রি ইত্যাদি উপন্যাস, লোয়ার ডেপথ্, দি ফিলিষ্টাইনস ইত্যাদি নাটক এবং মানুষের জন্ম, বুড়ো ইজেরগিল, আমরা ছাব্বিশজন ও একটি মেয়ে, কমরেড, কনোভলা প্রভৃতি গল্প নতুন পৃথিবী, সমাজ ও সংস্কৃতি অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতির সম্পদ হয়ে আছে। ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত লেখকদের প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। বিশ্বে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে, শান্তির স্বপক্ষে এই মহান লেখক আজীবন

সংগ্রাম করে গেছেন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে, অচৈতন্য অবস্থায় তাঁর শেষ বাণী—'যুদ্ধ আসছে…আমাদের প্রস্তুত হওয়া দরকার।' পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবী সাহিত্যিকদের তিনি ধ্রুবতারা।

ফ্রান্সের শ্রমিক আন্দোলন অধ্যুষিত প্যারিসের আসানিয়ার্সে অঞ্চলে জন্ম। প্রথম জীবনে দুঃখবাদী ও ব্যক্তিবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রেপ্তার হন এবং জনসাধারণে সংস্পর্শে এসে ব্যক্তিবাদী ধারণা কাটিয়ে ওঠেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এই অক্লান্ত যোদ্ধা ক্লার্তে যুদ্ধ বিরোধী লেখক গোষ্ঠী সংগঠন করেন। একাধারে সাংবাদিক-কবি-ঔপন্যাসিক এই মহান শিল্পী সোভিয়েতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। মস্কোতে তাঁর মৃত্যু হয় এবং স্তালিন স্বয়ং তাঁর কফিন পরিবহন করেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'লে স্যুপ্লিয়র্তা', 'লাঁফে', 'ল্যাফ্য', 'এলেভসিয়ঁ'।

এছাড়া 'ফে দিভের', 'স্য কি ক্য সরা' সহ বহু গল্প সংকলন এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সংকলন তাঁর অমর রচনা।

পিতৃদত্ত নাম চৌ স্যু-ড়েণ। ১৯১৮ সালে লিখিত 'উন্মাদের দিনলিপি' গল্পে 'লু স্যুন' এই লেখক নাম গ্রহণ করেন এবং এই নামেই চীন দেশে তথা সারা বিশ্বে তাঁর পরিচিতি। কুও মিন তাঙের শ্বেত সন্ত্রাসের মধ্যেও লেখালেখি চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছদ্ম নামে লেখেন। ১৯২৭ সাল থেকে তিনি চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩০ সালে বামপন্থী লেখক সংঘের উদ্বোধনী সভায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রাবন্ধিক হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। 'আ কিউ এর সত্য কাহিনী', 'বিক্ষিপ্ত চিন্তা', 'বুনো ঘাস' 'চীনা গল্প সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' ও কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ সংকলন। পরবর্তীকালে পিকিঙ থেকে লু স্যুনের 'নির্বাচিত গল্প' এবং 'নির্বাচিত রচনা সম্ভার' প্রকাশিত হয়েছে।

রাশিয়ার এই মহৎ কথাশিল্পী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সাংবাদিক হিসেবে রেড আর্মির সঙ্গী ছিলেন। তাঁর বিশ্বখ্যাত উপন্যাস—'ঝড়', 'প্যারীর পতন', 'নবম তরঙ্গ' ইত্যাদি।

ফরাসী দেশের সেন্ট ডেনিসে জন্ম। আসল নাম ইউজিন নিগ্রণ্ডেল। ফ্রান্সের সুররিয়ালিষ্ট আন্দোলনের উজ্জ্বল তারকা। নাজি বাহিনী ফ্রান্সে অভিযান চালালে তিনি প্রতিরোধ সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি'তে যোগ দেন। **Capitale de la don leur** সহ বহু প্রখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রখ্যাত এই ফরাসী লেখক প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। মূলতঃ তিনি কবি। নাৎসি-বিরোধী প্রতিরোধের লড়াইয়ের সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ ফরাসীদের দাসত্ব ও গৌরব রচনা করেন। আমৃত্যু তিনি ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি'র সদস্য ছিলেন। পাবলো নেরুদার অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু এই কবি যোদ্ধা সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে নতুন মূল্যবোধের উপর অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন।

প্রখ্যাত জার্মান নাট্যকার তথা সমালোচক। মা, মাদার কারেজ ও তাঁর পুত্র কন্যাগণ, শ্রীমতী কারার এর রাইফেল, লুকুল্লুসের জবানবন্দী, সেৎজুয়ানের মহান মানুষটি, গ্যালিলিওর জীবনী, পুন্টিলা মহাশয় এবং তাঁর ভৃত্য মাত্তি প্রভৃতি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্রেশট-এর মৌলিক নাটক। ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতাশীল হলে জার্মানি ত্যাগ করেন। ১৯৩৯-৪৭ আমেরিকায় কাটান। এপিক থিয়েটারের প্রবক্তা ব্রেশট্ কবি ও গদ্যকার হিসেবেও জার্মান সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

রাশিয়ার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সোভিয়েত লেখক সংঘের সভাপতি। বিখ্যাত উপন্যাস—**Cities and Years, Brothers, Sanatorium, Arcturus, Early joys, No ordinary Summer, The conflagration.**

পাবলো নেরুদা (১৯০৪—১৯৭৩)

আসল নাম নেফাতালি রিকার্দো রেইস বাকুয়াতালি। সার্বভৌম চিলির সীমান্তশহর পাররেল এক শ্রমিক পরিবারে পাবলো নেরুদার জন্ম। পড়াশুনো সান্টিয়াগোয়। ১৯২৬ সালে তিনি বৈদেশিক দপ্তরে চাকরি নিয়ে বিভিন্ন